আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান

শেখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদী কুতুবখানা

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান ★ মুহাম্মদী কুতুবখানা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল ঃ শায়খুল ইসলাম প্রফেসর ডঃ তাহির আল কাদেরী
অনুবাদ ঃ আহমদুল্লাহ ফোরকান খান

পরিবেশনায়
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ আবুল হোসেইন

প্রথম প্রকাশ - ১২ রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী
২১ মার্চ ২০০৮ ইংরেজী

হাদিয়া ঃ ৬০.০০ (ষাট) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ প্যান্টন কালার প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকের কথা

নাহমাদুহু ওয়া-নুসাল্লি ওয়া-নুসাল্লিমু আলা হাবিবিহিল করীম

ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের আদর্শে বিশ্বাসীদের সংখ্যা হাতেগোণা নয় অগণিত। সুন্নীয়তই সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় দর্শন হওয়া সত্ত্বেও এবং মূলধারারায় বিশ্বাসী সুন্নী জনতার দেশে দেশে আধিক্য থাকার পরও একটি জায়গায় এসে আমাদের স্থবিরতা ও শূন্যতা স্বীকার করতেই হয়। পূর্বসূরি উলামা-বুজুর্গরা বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে সুন্নীয়তের বাগানকে বহু গুণ সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করে গেছেন। তাঁদের দেখানো পথে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই সুন্নীয়তের মিশন প্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে নিতে যতটুকু কাজ ও প্রস্তুতি দরকার ছিল তা অন্তত এদেশে বহুদিন ধরে থমকে দাঁড়িয়েছিল। যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরবী উর্দুতে রচিত বই-পুস্তকের ভাষান্তর খুব জরুরী হলেও বাংলা ভাষায় সুন্নী দর্শনের ওপর ও আক্বীদা ভিত্তিক গ্রন্থ রচনায় সীমাহীন দৈন্যদশা দেখে আমার মতো অনেকেই হয়তো অস্বস্তিতে ছিলেন। তাই মূল ধারার, মৌলিক আদর্শ ও চিন্তাধারায় উজ্জীবিত মানুষকে এগিয়ে নিতে ও সত্যানুসন্ধানীদের চিন্তা ও মানস গঠনোপযোগী বই-পুস্তক প্রকাশে আমি নিজেকে উৎসর্গ করলাম। বৈষয়িক ফায়দা ও লাভের আশায় নয়, কেবল সুন্নীয়তের কাঙ্ক্ষিত প্রচার-প্রসারে প্রকাশনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়াই আমার পরম লক্ষ্য। এ চিন্তা ও উপলব্ধি থেকেই মুহাম্মদী কুতুবখানার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক লুৎফর রহমান সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতায় আমার পথচলা শুরু হলো ইনশাআল্লাহ।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বরেণ্য ইসলামী মনীষী শায়খুল ইসলাম, গবেষক, ড. আল্লামা তাহির আলকাদেরীর কয়েকশত মৌলিক ও প্রামাণ্য আক্বীদাভিত্তিক গ্রন্থের মধ্যে শুরুতেই 'আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান'র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করলাম। বিষয়বস্তু ও গুরুত্বের দিক থেকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ, গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন তরুণ আলিমে দ্বীন, লেখক ও অনুবাদক মাওলানা আহমদুল্লাহ ফোরকান খান। উর্দু থেকে অনূদিত গ্রন্থটি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতার প্রেরণা থেকেই বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য পেশ করা হলো। উসিলাতেই যে মানব জীবনের পুলসিরাত পার এ বড় সত্যটিই এখানে জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে কুরআন সুন্নাহ্‌র মৌল সূত্র অবলম্বনে। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে কিরামের শুভদৃষ্টিতেই মানুষের জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সৌভাগ্যের দুয়ার উম্মোচিত হয়-এ শাশ্বত সত্যকে কবুল করার সতত প্রয়াসই আল্লামা তাহির আলকাদেরীর এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য ও আহবান। তাই বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ঈমান-আক্বীদার হেফাজতে এবং সঠিক পথে ও মতে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজনে এ গ্রন্থটি সুন্নী জনতার মাঝে আদৃত হবে বলে আমি মনে করি। মহাত্মা নবী-অলীদের পূণ্য স্পর্শে সবার জীবনে করুণাধারা বর্ষিত হোক। আমিন।

বিনীত
মুহাম্মদ আবুল হোসেইন

দেশের ঠিকানা
হোসেইন মনজিল
১১, সওদাগর টোলা
ধোপাদীঘির উত্তর পাড়
সিলেট।

প্রবাসের ঠিকানা
M. A. Husain
96, Normour Road
Fenham
New Castly upon Tyne
NE 4-8SH U.K

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকের আরজ

ইসলামের মৌলিক আকীদা ও চিন্তাধারায় কোন কালেই ঐকমত্য ছিল না। শুরু থেকেই একটি দল ইসলামী বিধি-বিধান ও আকীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বিপরীতে কুচক্রীর ও বিকৃত রুচির মানুষেরা অনৈকতা জোর করেই ইসলামের মৌলিকত্বকে আঘাত করেছে। কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান ও নীতি-আদর্শকে যারা বিনীতভাবে মেনে নেয় তারাই আহলে হক তথা মূল ধারার সত্যগ্রহী দলের শীর্ষে রয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবা ও উম্মতশ্রেষ্ঠ আউলিয়ায়ে কেরাম। তারা যা বলেছেন নিজেরা কর্মজীবনে যে বোধ-বিশ্বাস লালন করেছেন এবং সর্বস্তরের ঈমানদার জনতার জন্য নির্দেশনা পেশ করেছেন তাই ইসলামের মূল নির্যাস ও চিরন্তন অনুসরণীয় নীতিমালা। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তথা-মর্গ এলগ্রুপের দিব্য দৃষ্টিতে মানুষের জীবনে অনুকূল পরিবর্তন আসে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপূর্ণতা ও গ্লানি দূর হয়ে মানুষের সৌভাগ্য ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয় এটাই ইসলামের কল্যাণময়ী দর্পণের একটি মৌলিক মীমাংসিত বিষয়। মহাত্মা নবী-অলিদের কাছে দয়া ও দোয়ার ভিখারী হওয়া যে মোটেই তাওহিদী চেতনার সাথে সাংঘটিক নয় বরং আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিতে মহামানবদের পক্ষে ত্রাণকর্তার রূপ ও গুণ অর্জন করা সম্ভব এটাই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক, কলমসম্রাট প্রফেসর আল্লামা তাহের আলকাদেরীর 'মাসআলায়ে ইস্তিগাসা আওর উস্‌কী শররী হায়সিয়ত' গ্রন্থটি আমাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছে। এটি ভাষান্তর করে বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এর বাণী ও আবেদন পৌছানোর একটা তাগাদা অনুভব করছিলাম দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে আল্লাহর রহমত ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগ্রহে গ্রন্থটি অনূদিত করার প্রয়াস শুরু করি। বাংলাদেশ তথা চট্টলার সুন্নীয়তের প্রকাশনা শিল্পের পথিকৃৎ মুহাম্মদী কুতুবখানার মুহতরম অধ্যাপক লুৎফুর রহমানের আগ্রহ ও বদান্যতায় গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। এজন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া এবং প্রিয় নবীর (দঃ) চরণে সালাত-সালামের নজরানা পেশ করছি। তবে গ্রন্থটি প্রকাশে ইংল্যান্ড প্রবাসী মুহাম্মদ আবুল হোসাইনের অক্লান্ত ত্যাগ ও সদিচ্ছা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ করছি। এর প্রকাশক হিসেবে সুন্নীয়তের জন্য উৎসর্গীত জনাব মুহাম্মদ আবুল হোসাইন যে কুরবানী ও খুলুছিয়তের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

নবী -অলিসহ আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার বৈধতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে গ্রন্থকার ড. তাহের আলকাদেরী তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে শাশ্বত সত্যকেই উচ্চকণ্ঠে বিবৃত করেছেন এ গ্রন্থে। কুরআন মজিদ ও হাদীস শরীফে উসিলার। সপক্ষে বহু বাণী ও প্রমাণ উপস্থাপিত হলেও সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোধগম্য হয়ে ওঠেনা প্রয়োজনীয় দ্বীনি কানের অভাবে। তাই উসিলার মতো একটি মৌলিক চিন্তাদর্শনকে সবার মর্মে-চিত্তে প্রবিষ্ট করার অনন্য দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থ। সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনার মতোই আল্লামা তাহের আলকাদেরী অসাধারণ দক্ষতায় এ গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গ্রন্থটি রচনায় সক্ষম করেছেন বলেই অনুমিত হয়। সমাজ সংস্কার এ দ্বীনি মিশনের বার্তাবাহী মহান ব্যক্তিত্ব আল্লামা কাদেরীর গভীর লেখক -সত্তা, অসাধারণ পান্ডিত্য ও মিল্লাতের প্রতি দায়বদ্ধতার সুস্পষ্ট ছাপ গ্রন্থের পাতায় পাতায় লক্ষণীয়। উর্দু সাহিত্যের উঁচু মার্গের শব্দপুঞ্জ ও বাক্যরীতি অনেকের পক্ষে অনুধাবন করা হয়তো কঠিন। তা সত্ত্বেও বয়সে ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কবুল করেই গ্রন্থটির তথাই ভাষান্তরে আমি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। গ্রন্থের মূল ভাবানুবাদ প্রকাশে আমি সতর্ক এ সযত্ন থেকেছি। তবুও কোন জায়গায় ব্যতিক্রম কিছু তারি দৃষ্টি হলে তা পরবর্তীতে সংশোধন সুযোগ থাকবে। গ্রন্থটি পাঠে যারা আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা দেখিয়েছে সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। উসিলার ওপর মানুষের জ্ঞান এ জ্ঞানার পরিধি বাড়াতে আমাদের যে উদ্যোগ তা সুধী পাঠকদের কাছে গ্রহনীয় হলেই আমার শ্রম সার্থকতা পাবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব (দঃ) এর উসিলায় এবং আউলিয়ায়ে কেরামের সুদৃষ্টিতে আমাদের ওপর করুণধিরো অবারিত করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ সাহায্য প্রার্থনার প্রথম পাঠ	৯
• ইস্তিগাছা এর শাব্দিক বিশ্লেষণ	১২
• ইস্তিগাছার প্রকারভেদ	১৩
• ইস্তিগাছা ও তাওয়াস্ সুলের পারস্পরিক সম্পর্ক	১৫
• ইস্তিগাছা ও দু'আর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	১৬
• কুরআন করীমে দু'আ শব্দের ব্যবহার	১৬
• দু'আর কল্পিত প্রকারভেদ	১৯
• বিভাজনের দ্বারা প্রাপ্ত ভিন্নতা এখানে অনুপস্থিত	২১
• দু'আর অর্থ শুধুমাত্র ইবাদত নেওয়া অযৌক্তিক	২১
• সুরা ফাতিহা এবং সাহায্য প্রার্থনার বিধান	২৩
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তাজেদারে আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনার বিধান	২৫
• হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের আলোকে 'সাহায্য প্রার্থনা'	২৭
• সাইয়িদুনা আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাহায্য প্রার্থনা	২৮
• সাইয়িদুনা কাতাদাহ ইবনে নু'মানের (রাঃ) সাহায্য প্রার্থনা	৩০
• ফোড়া আক্রান্ত সাহাবীর (রাঃ) সাহায্য প্রার্থনা	৩১
• অন্ধ সাহাবীর (রাঃ) সাহায্য প্রার্থনা	৩২
• জনৈক সাহাবীর (রাঃ) বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা	৩৩
• সাইয়িদুনা আমীর হামযা (রাঃ) দুঃখ মোচনকারী	৩৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ মৃত্যুর পর সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা	৩৫
• কবর জীবনের প্রমাণ	৩৭
• 'রূহ'-এর হায়াত ও ক্ষমতা	৪১
চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিভ্রান্তির অপনোদন	৪২
• প্রথম আপত্তি ঃ সাহায্য প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদত	৪৩
• প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত নয়	৪৪
• দ্বিতীয় আপত্তি ঃ অলৌকিক বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক	৪৬
• আপত্তির বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ	৪৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

- প্রথম নুকতা ৪৭
- দ্বিতীয় নুকতা ৪৭
- তৃতীয় নুকতা ৪৮
- সঠিক ইসলামী আক্বীদা ৪৮
- চতুর্থ নকুতা ৪৮
- হাকীকত ও মাজাযের বিভাজন অপরিহার্য ৪৯
- অলৌকিক বিষয়ে মাজাযের বৈধতা ৫০
- জিবরাঈলের (আঃ) উপর শিরকের ফাতওয়া? ৫১
- সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ) এর উপর শিরকের ফাতওয়া ৫২
- প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ৫৩
- এটা কি মুজিযা নয়? ৫৩
- আল্লাহ তায়ালার উপর শিরকের ফাতওয়া? ৫৫
- রূহ ফুঁকে দেওয়া মুলতঃ আল্লাহ তায়ালার কাজ ৫৫
- তৃতীয় আপত্তি ঃ অন্যের ওয়াসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে অদৃশ্য ক্ষমতার সন্দেহ বিদ্যমান ৫৬
- মনগড়া আক্বীদাগত ফিতনার খন্ডন ৫৬
- একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ৫৭
- মাখলূকের কাছে দূরের ইল্‌ম থাকতে পারে? ৫৮
- কাশফে ফারূকী ৫৯
- কাশফ ও ইলমে গায়বের পার্থক্য ৬০
- নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির যোগ্যতার প্রমাণ ৬১
- চতুর্থ আপত্তি ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই ৬৪
- ভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন ৬৬
- পঞ্চম আপত্তি ঃ সাহায্য প্রার্থনা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই জায়েয ৬৭
- প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ৬৭
- আরো কিছু চাও ৬৯
- সাহায্য প্রার্থনা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ৭০
- ষষ্ঠ আপত্তি ঃ সরওয়ারে কায়িনাত (দঃ) এর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নিষেধাজ্ঞা ৭৩
- হাদীসে মুবারাকের বিশুদ্ধ অর্থ ৭৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ঈমান ও কুফরের ব্যবধানকারী সীমারেখা ৭৬
- শেষ কথা ৭৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَوْلَاىَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

প্রথম অধ্যায়

সাহায্য প্রার্থনার প্রথম পাঠ

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা। তিনি সর্বশক্তিমান এবং প্রকৃত সাহায্যকারী। ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে পরিচালিত সকল কার্যক্রম ও ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ঐ মহান স্বত্ত্বা,যাঁর নির্দেশে দিবা রাত্রির পরিক্রমা চলছে। তিনি তাঁর স্বত্ত্বা ও গুণাবলীতে এক, অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমকক্ষ নেই। প্রাণীকুলকে জীবন দান করা, এক মুহূর্তের মধ্যে প্রদত্ত জীবনকে ছিনিয়ে নেয়া এবং সুবিশাল সৃষ্টি জগতের সুশৃঙ্খল পরিচালনায় তাঁর কোন সাহায্যকারী ও অংশীদার নেই।

সমগ্র জাহানের একক নিয়ন্তা ও দৈনন্দিন জীবনের ক্রমোন্নতি সাধনকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। সৃষ্টি জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর উপর আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো মৌলিক আধিপত্য নেই।

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ কোন কিছুর উপর আপন ইচ্ছায় মালিক হতে পারেন না। কেবল তখনই পারেন যখন স্বয়ং তিনি কাউকে মালিক বানান অথবা ক্ষমতা দান করেন। এমনকি নিজের ও নিজের ছয়ফুট শরীরের উপরও কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা নেই। কল্যাণ-অকল্যাণ, জন্ম- মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হবার ক্ষমতাও কারো নেই। আল্লাহ্ই মৃত্যু দেন। তিনিই জীবন দান করেন। আমাদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।

আহকামে ইসলাম ও কুরআন হাকীমের চিরন্তন শিক্ষার আলোকে কল্যাণ-অকল্যাণ, মালিকানা, ক্ষমতা ইত্যাদি বান্দা অর্জন করতে পারে কার্যকারণের মাধ্যমেই। সৃষ্টি,অস্তিত্বদান, প্রভাব বিস্তার ও ক্ষমতার অর্থে কোন বান্দা কারো কল্যাণ-অকল্যাণ করতে পারে এ বিশ্বাস রাখা অকাট্যভাবে হারাম।

সুক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বুঝা যায়, সৃষ্টি জগতের কেউ জন্ম-মৃত্যু, কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখা বা কোন কিছুর উপর মালিক ও ক্ষমতাধর হওয়া এমনকি তার সকল কাজই হাকীকি তথা মৌলিক নয় বরং মাজাযী (রূপক) অর্থেই যথার্থ। এসব বিষয়ের মৌলিক সম্পাদনকারী কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার মহান সত্ত্বা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ বাস্তবতার বর্ণনা এবং কুরআন মাজীদে বর্ণিত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ থেকে মর্মার্থ উদঘাটনের ক্ষেত্রে কিছু লোক শাব্দিক বিশ্লেষণের মার-প্যাঁচে পড়ে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে তারা কুরআন করীমের আয়াত সমূহের মর্মার্থ গ্রহন করতে গিয়ে হাকীকত ও মাজায-এর পার্থক্য এবং মধ্যমপন্থা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র হাকীকি অর্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ করাকেই সঠিক মনে করেছন। এমনকি তারা মাজায তথা রূপক অর্থের বৈধতাকেও স্বীকার করতে চান না।

কারণ তারা পূর্বসুরী সম্মানিত ইমামগণের বিশ্লেষণ ও তাফসীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আক্বাইদের ক্ষেত্রে মনগড়া তাফসীরের মাধ্যমে বিদ্‌আতে সায়্যিআহ্ প্রচলন এবং কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক শিক্ষার পরিপন্থী নতুন নতুন আক্বাইদের জন্ম দিতে ব্যস্ত।

এমতাবস্থায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, অন্য দিকে এমন কিছু সাধারণ মুর্খশ্রেণীর লোক আছেন যারা 'মাজায'-এর ব্যবহারের ক্ষত্রে সীমাতিক্রম ও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। তারাও মধ্যমপন্থার নীতি পরিত্যাগ করেছেন। যদিও তারা আন্তরিকভাবে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের একত্ববাদ ও পবিত্রতা এবং অন্যান্য ইসলামী আকাইদের উপর পরিপূর্ণ ও দৃঢ় ভাবে বিশ্বাসী, তবুও মাজাযের অতিশয় ব্যবহারের কারণে মাজাযী অর্থের অমান্যকারীদের মতোই নিন্দনীয়।

সত্যের সন্ধানীরা মধ্যমপন্থার নীতিই অবলম্বন করে থাকেন। হাকীকত ও মাজাযের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কুরআন কারীমের মধ্যমপন্থার নীতি গ্রহণ করা হয়, তাহলে উক্ত দু'দলের মধ্যকার সাগর সমান ব্যবধানকে ঘুচিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌কে পুনরায় একটি শরীরে পরিণত করা সম্ভব হবে।

দ্বীনে হক্বের সংরক্ষণ, তাওহীদের সুউচ্চ স্থানের সঠিক বিশ্লেষণ ও অপরকে বোঝানোর জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইসলামী আকাইদের আলোচনার সময় পূর্বসুরী আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে 'ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ'কে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তার আকীদা একেবারেই মধ্যমপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

যদি বর্তমান যুগে তার আকীদার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দুটি বিপরীতমুখী দলকে সহজেই একীভূত করা সম্ভব হবে।

দুঃখজনক হলেও অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো এটাই যে, নিজেদের অজ্ঞতার কারণে ইসলামী আকাইদের মধ্যে বিদআত সংযোজনে ব্যস্ত দলটি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহর শিক্ষার মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের কল্পিত ও ভিত্তিহীন আকাইদকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

অপরদিকে বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা সম্পর্কে স্বল্প লেখাপড়া করা কিছু লোক বাস্তবতা সম্পর্কে না জানার কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়াকে অনৈসলামিক আকীদার প্রচারক মনে করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আকীদা হলো অধিকাংশ মুসলমানের আকীদা। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এক। তিনি অদ্বিতীয়। একমাত্র উপাস্য তিনিই। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁকেই হাক্বীক্বী সাহায্যকারী জানতে হবে। ভরসা করতে হবে তাঁর উপরই। বিপদের সময় তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে।

আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে প্রকৃত (নিজ ক্ষমতায়) সাহায্যকারী মনে করা ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নামান্তর। শুধুমাত্র আল্লাহই সৎকাজের তাওফীক দেন। পাপসমূহ মার্জনা করার ক্ষমতা রাখেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কাউকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারেনা। নেকী তথা ভাল কাজের তাওফীক দিতে পারেনা।

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) ও আউলিয়ায়ে কিরাম (রাহঃ)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ হবে মাজাযী সাহায্যকারী হিসেবেই। এটাই প্রকৃত ইসলামী আকীদা। তা থেকে কিঞ্চিত পদস্খলন হবে ভ্রান্ত আক্বাইদের কাছে নতি স্বীকার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

استغاثة (ইস্তিগাসা)-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ

استغاثة শব্দটির মূল অক্ষর غ — و — ث (غوث) এর অর্থ সাহায্য। তা থেকে استغاثة শব্দটি গঠিত। এর অর্থ হলো 'সাহায্য প্রার্থনা করা'।

ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানী (রাহঃ) استغاثة-এর শাব্দিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন الغوث : يقال في النصرة والغيث من المطر — واستغثته : طلبت الغوث أوالغيث .

- "غوث শব্দের অর্থ 'সাহায্য' এবং غيث শব্দের অর্থ 'বৃষ্টি'। استغاثة এর অর্থ হলো কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা অথবা আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।" (আল মুফরাদাতঃ ৬১৭)

কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে استغاثة শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে সাহাবায়ে কিরামের প্রার্থনার বর্ণনা সূরায়ে আনফালে এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ

-"যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে (সাহায্য চেয়ে) প্রার্থনা করছিলে"। (সূরায়ে আনফাল, ৮ঃ৯)

সাইয়িদুনা মূসা আলাইহিস্ সালাম এর কাছে তাঁর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকে সাহায্য করার ঘটনাটি কুরআন মাজীদ استغاثة শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছে। সূরা আল ক্বাসাসে আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ-

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ .

- "তখন ওই লোক যে তাঁর দলের ছিলো সে মূসার নিকট সাহায্য চাইলো তারই বিরুদ্ধে, যে তাঁর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" - (সূরা আল-ক্বাসাস ঃ ১৫ঃ ২৮)

অভিধান শাস্ত্রবিদদের মতে استغاثة ও استعانة উভয় শব্দ সাহায্য চাওয়ার অর্থে আসে। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (রাহঃ) استغاثة শব্দের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন-

وَالْإِسْتِغَاثَةُ طَلَبُ الْعَوْنِ .

- استغاثة "শব্দের অর্থ হলো সাহায্য চাওয়া।" (আল মুফরাদাতঃ ৫৯৮)

استغاثة শব্দটিও কুরআন মাজীদে সাহায্য প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ফাতিহায় বান্দাকে দুআর নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে কুরআন মাজীদ বলছে-

إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

- "তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (সূরা ফাতিহা ১ঃ৪)

استغاثة- এর প্রকারভেদ ঃ

আরবী অভিধান শাস্ত্রবিদ ও মুফাস্‌সিরীনে কুরআনের বিশ্লেষণের আলোকে استغاثة-এর অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা। استغاثة দু' ধরনের হতে পারে।

(১) استغاثة بالقول **(মৌখিক সাহায্য প্রার্থনা)**

(২) استغاثة بالعمل **(কাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা)**

বিপদগ্রস্ত কোন ব্যক্তি যদি মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তাহলে তা হচ্ছে استغاثة بالقول ।

আর যদি সাহায্য প্রার্থী স্বীয় অবস্থা ও কাজের মাধ্যমে সাহায্য চায়,তাহলে তাকে استغاثة بالعمل বলা হয়।

استغاثة بالقول (মৌখিক সাহায্য প্রার্থনা) ঃ

কুরআন মাজীদে সাইয়িদুনা মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় استغاثة بالقول এর দৃষ্টান্ত এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ —

- "আর আমি ওহী প্রেরণ করেছি মূসার প্রতি-যখন তার নিকট তার সম্প্রদায় পানি চেয়েছে- এ পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করো।" (আল আ'রাফঃ ৭ঃ১৬০)

ইসলাম স্বভাবগত ধর্ম।সাইয়িদুনা আদম (আলাইহিস্ সালাম) থেকে শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত সমস্ত নবীগণের ধর্ম। তাওহীদ তথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

একত্ববাদের বিশ্বাস হচ্ছে সকল নবীর শরীয়তেরই মূল ভিত্তি এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শরীয়তে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ কোন নবীর শরীয়তের শিক্ষার আলোকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত ছাড়া আর কোন হাক্বীক্বি সাহায্যকারী নেই। তথাপি উক্ত আয়াতে মুবারাকায় সাইয়িদুনা মূসা (আঃ)-এর কাছে পানি চেয়ে استغاثة করা হয়েছে। যদি এ কাজটি শিরক হতো, তাহলে এ শিরক মিশ্রিত আবেদনের ভিত্তিতে মু'জিযা দেখানো হতো না। কেননা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যখনই কোন নবীর কাছে তাওহীদের পরিপন্থী কোন আবেদন পেশ করা হয়েছে তৎক্ষণাত তাঁরা শিরকের সকল পথ রুদ্ধ করার প্রয়াসে তা কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আলাইহিস্ সালাম)-এর সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং সাইয়িদুনা মূসা (আঃ) কে মু'জিযা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন।

এর উদ্দেশ্যে হলো- আল্লাহ্ তায়ালা এটাই স্পষ্ট করে দিলেন যে, প্রকৃত সম্পাদনকারী তো নিঃসন্দেহে আমিই কিন্তু হে মূসা (আঃ), মু'জিযা প্রকাশের জন্য আমি তোমাকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

استغاثة بالعمل (কাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা)

বিপদের সময় মৌখিক কোন শব্দ ব্যবহার না করে কোন বিশেষ কাজ ও অবস্থার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করাকে استغاثة بالعمل বলা হয়। কুরআন মাজীদে ইস্তিগাছা বিল আমলের বৈধতার সপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় ও সম্মানিত নবীগণের (আলাইহিমুস্ সালাম) ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

সাইয়িদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর বিচ্ছেদে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করার কারণে তাঁর সম্মানিত পিতা সাইয়িদুনা ইয়াকুব (আঃ) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) এটা জানতে পারলেন তখন নিজের একটি জামা ভাইদের মাধ্যমে তার সম্মানিত পিতার কাছে ইস্তিগাছার উদ্দেশ্যে পাঠালেন এবং বললেন, এটা আমার সম্মানিত পিতার চোখে লাগাবেন। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এ ঘটনা আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত কালামে মাজীদে নিম্নোক্ত শব্দাবলীর দ্বারা বর্ণনা করেছেন-

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَأْتِ بَصِيْرًا .

- "আমার এই জামা নিয়ে যাও। এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।" (সূরা ইউসুফ, ১২ঃ ৯৩)

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা যখন জামাটি নিয়ে সাইয়িদুনা ইয়াকুব (আঃ)-এর চোখে বুলিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে-

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ـــ

-"অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা উপস্থিত হলো তখন সে জামাটা ইয়াকুবের মুখের উপর রাখলো, তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো।" (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৯৬)

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের মনোনীত পয়গাম্বর সাইয়িদুনা ইয়াকুব (আঃ)-এর বরকতময় আমল যা দ্বারা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে তা ব্যবহারিক ভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা দ্বারা ইস্তিগাছা। এটা হচ্ছে استغاثة بالعمل-এর সর্বোৎকৃষ্ট কুরআনী দৃষ্টান্ত। যাতে সাইয়িদুনা ইউসুফ (আঃ)-এর জামা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দৃষ্টিশক্তি পাওয়ার ওয়াসীলা হয়েছে।

استغاثة ও توسل -এর পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ

استغاثة ও توسل উভয়ের মধ্যে বাস্তবে একই বিষয় উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য শুধুমাত্র فعل এর দিক থেকেই। যখন ঐ فعل তথা কাজের সম্পর্ক সাহায্য প্রার্থীর দিকে করা হয় তখন ব্যক্তির এ আমলকে استغاثة বলা হয়। আর মুস্তাগাছে মাজাযী (আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অপরকে সাহায্য করার উপযুক্ত মনে করে যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়) হলেন ওয়াসীলা। কেননা প্রকৃত সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্ তায়ালা। সুতরাং ইয়াকুব (আঃ)-এর আমল হলো استغاثة । আর জামাটি হলো ওয়াসীলা।

আর যদি সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দু'আ করে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাহলে যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারের চেয়ে বড় কোন দরবার নেই তাই আল্লাহ্ তায়ালা কোন ধরনের ওয়াসীলা ছাড়া প্রকৃত মুস্তাগাছ হবেন।

উপর্যুক্ত কুরআনী বর্ণনায় استغاثة بالعمل আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমাণিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

[আক্বীদায়ে তাওয়াস্‌সুল সম্পর্কে ভালভাবে জানার জন্য লেখকের রচিত "কুরআন ওয়া সুন্নাত আওর আক্বীদায়ে তাওয়াস্‌সুল" গ্রন্থটি দেখুন]

استغاثة ও دعا -এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ঃ

দুঃখ, যাতনা ও কষ্টের মধ্যে কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করাই হচ্ছে استغاثة । অপরদিকে সাধারণ আহবান করাকে দু'আ বলা হয়। এতে দুঃখ, বেদনা ও কষ্টের শর্ত নেই। দু'আ ও ইস্তিগাছার মধ্যে عموم وخصوص مطلق এর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ দু'আ শুধুমাত্র আহবান জানানোকে বলা হয়। এ জন্য সকল ইস্তিগাছা দু'আ। কিন্তু সকল দু'আ ইস্তিগাছা নয়। ইস্তিগাছা ও দু'আর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এটাই।

কুরআন করীমে دعا (দু'আ) শব্দের ব্যবহার ঃ

دعا ـــ يدعو ـــ دعوة এর অর্থ ডাকা ও আহবান করা। কুরআন করীমে دعا শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে দু'আ এর কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট করার মানসে তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ উল্লেখ করা হলো-

(১) النداء (আহবান করা) ঃ

কুরআন মাজীদে সাধারণতঃ دعا শব্দটি نداء তথা আহবান এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কখনো نداء ও دعا উভয় শব্দ একটি অপরটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন মাজীদে এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّادُعَاءً وَنِدَاءً

- "এবং কাফিরদের উপমা ঐ ব্যক্তির মতো, যে ডাকে এমন কিছুকে, যা শুধু হাঁকডাক ছাড়া আর কিছুই শুনেনা।"(সুরা আল বাক্বারাহ, ২ঃ ১৭১)

(২) التسمية (নামকরণ) ঃ

আরবী ভাষায় কখনো دعا শব্দটি নামকরণ বা নাম ধরে ডাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানী (রাঃ) উদাহরণ পেশ করেছেন- دَعَوْتُ ابْنِي زَيْدًا "আমি আমার ছেলের নাম যায়েদ রেখেছি।" (আল মুফরাদাত ঃ ৩১৫)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তায়ালা কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন-

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا .

- "রাসূলের আহবানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করো না যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।" (আন্-নূর, ২৪ ঃ ৬৩)

এ আয়াতে করীমায় স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা মুস্তাফার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারের আদব বর্ণনা করেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো তাজেদারে আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে কখনোই তাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ বলে না ডাকা বরং যখন ডাকার ইচ্ছা হবে ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইয়া হাবীবাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইত্যাদি লকব দ্বারা আহবান করা।

যেমন আল্লাহ্ তায়ালা সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক হওয়া সত্ত্বেও পুরো কুরআন মাজীদের কোন স্থানেই সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে সম্বোধন করেননি।

(৩) استغاثة (সাহায্য প্রার্থনা করা) ঃ

دعا শব্দটি কুরআন মাজীদের কয়েকটি স্থানে প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

وَقَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

- "(তারা) বললো, আপন রবের নিকট প্রার্থনা করুন"। (সূরা আল বাকারাহ ২ ঃ ৬৮)

(৪) الحث على القصد (কোন উদ্দেশের প্রতি উৎসাহিত করা) ঃ

دعا শব্দটি কখনো কোন বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কুরআন মাজীদে এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ

- "ইউসুফ আরয করলো, হে আমার রব! আমার নিকট কারাগার অধিক প্রিয় ওই কর্ম থেকে, যার প্রতি তারা আমাকে আহবান করছে।" (ইউসুফ, ১২ ঃ ৩৩)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করার অর্থে কুরআন মাজীদে دعا শব্দের ব্যবহার সূরা ইউনুসে এভাবে এসেছে-

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

-"এবং আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন।" (সূরা ইউনুস ১০ঃ২৫)

(৫) الطلب (খোঁজ করা, চাওয়া) ঃ

طلب অর্থাৎ চাওয়ার অর্থে আরবী ভাষায় دعا শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। কুরআন মাজীদে এর উদাহরণ নিম্নরূপ-

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ

- "আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা চাও।" -(সূরা হা-মীম আস সিজদা, ৪১ঃ ৩১)

(৬) الدعاء (প্রার্থনা) ঃ

دعا শব্দটি কখনো আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে কৃত প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের দু'আ এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –

"আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হবে এই, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য-যিনি সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।" (সূরা ইউনুস, ১০ঃ১০)

(৭) العبادة (উপাসনা) ঃ

আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতকে ও দু'আ বলা হয়। যেমন তাজেদারে কায়িনাত (দ.)-এর পবিত্র বাণী-

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

- "দু'আই ইবাদাত।" (জামিউত্ তিরমিযী, আব্ ওয়াবুদ্ দাওয়াত, ২ ঃ ১৭৩)

(৮) الخطاب (সম্বোধন) ঃ

دعا শব্দের উপর্যুক্ত বিভিন্ন অর্থ ছাড়াও কখনো তা সাধারণ সম্বোধন অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহুদ যুদ্ধ চলাকালীন সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এক পর্যায়ে দিশেহারা হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করছিলেন। সাহাবীদের ছোট একটি দল তাজেদারে খতমে নুবুওয়াত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আশে পাশে থেকে গেলেন। সে সময় যারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন দু'জাহানের মালিক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ডাক দেন। মাহবূবে কিবরিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ দরদমাখা আহবানকে কুরআন মাজীদ এভাবে বর্ণনা করেছে-

وَلَا تَلْوُوْنَ

اِذْ تُصْعِدُوْنَ عَلٰٓى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ اُخْرٰىكُمْ

- "যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না আর অপর দলের মধ্যে আমার রসূল তোমাদেরকে আহবান করছিলেন।" (আলে ইমরান ৩ ঃ ১৫৩)

এ আয়াতে করীমার উল্লেখিত শব্দ يَدْعُوْكُمْ অর্থাৎ, 'রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে ডাকছিলেন'-এর অর্থ 'ইবাদাতের জন্য আহবান' নেয়াটা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। কেননা নুবুওয়াতের সুমহান মর্যাদার সাথে শিরকের মিশ্রণের কল্পনাও সম্ভব নয়।

دعا এর কল্পিত প্রকারভেদ ঃ

আমরা কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত দু'আর বিভিন্ন প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে কিছু লোক ইস্তিগাছা ও তাওয়াস্সুলকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার জন্য দু'আর কিছু কল্পিত ও মনগড়া প্রকারভেদ প্রণয়ন করেছেন। অথচ তাদের কাছে ইস্তিগাছার বিপক্ষে দলীল হিসেবে কুরআন মাজীদের একটি আয়াতও নেই। তাদের সকল দাবীর ভিত্তি হলো মস্তিষ্ক প্রসূত যুক্তি। অথচ মানুষের জ্ঞান হচ্ছে অসম্পূর্ণ।

তো ইস্তিগাছাকে শিরক প্রমাণ করার জন্য প্রথমে একে দু'আর পোষাকে আচ্ছাদিত করা হলো। সে সাথে দু'আর দুটি মনগড়া প্রকারও পেশ করা হলো-

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) دعائے عبادت

(২) دعائے سؤال

১. دعائے عبادت (ইবাদাতের নিয়তে দু'আ) ঃ

দু'আর প্রথম প্রকার হচ্ছে ইবাদাত। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের সকল ইবাদাত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের দু'আ। যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন-

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

- "দু'আ হলো ইবাদাতের মগজ"। (জামিউত্ তিরমিযী, আব্ওয়াবুদ দাওয়াত, ২ ঃ ১৭৩)

যেমন জামি তিরমিযী শরীফেই বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে পাকে দু'আকে ইবাদাত বলা হয়েছে-

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ -"দু'আই ইবাদত।" (জামিউত্ তিরমিযী, আব্ওয়াবুদ দাওয়াত, ২ ঃ ১৭৩)

ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। তাই তাদের ধারণা হচ্ছে, এ অর্থের ভিত্তিতে গায়রুল্লাহ্র কাছে কৃত দু'আ তাঁর ইবাদাত হওয়ার কারণে শিরক হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

২. دعائے سؤال (আবেদনের উদ্দেশে দু'আ) ঃ

কারো কাছে আবেদন করা, কাউকে বিপদ থেকে ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর সামনে ভিার হাত প্রসারিত করাকে دعائے سؤال বলা হয়।

এক্ষেত্রে এ আপত্তি করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালাই যেহেতু একমাত্র বিপদ দূরীভূতকারী তাই যাবতীয় আবেদনও তাঁর কাছেই পেশ করা যাবে।

যেহেতু আবেদনকারীর আবেদন তার বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি দেয় তাই গায়রুল্লাহর কাছে আবেদন করা তার বান্দা দাবী করার নামান্তর। আর তা হচ্ছে শিরক। তাই সঙ্গত কারণেই বলা হয় سائل من دون الله অর্থাৎ -"আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে আবেদনকারী" মুশরিক।

تقسیم (বিভাজন) দ্বারা প্রাপ্ত مغا یرت (ভিন্নতা) এখানে অনুপস্থিত ঃ

ইস্তিগাছা বৈধ হওয়া ও না হওয়ার দৃষ্টিতে দু'আ এর উক্ত প্রকারভেদ ইস্তিগাছা বিরোধীদের জন্যও নিষ্প্রয়োজন। কেননা ইবাদাতের উদ্দেশে দু'আ ও আবেদনের উদ্দেশে দু'আ উভয়কে একই অর্থে ব্যবহার করে দু'আর প্রকারভেদ বর্ণনার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করা হয়েছে। এখানে দু'আয়ে সুওয়ালকেও দু'আয়ে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি দু'আয়ে ইবাদাত ও দু'আয়ে সুওয়াল উভয়ই গায়রুল্লাহর জন্য করাটা শিরক হয়,তাহলে দু'প্রকার দু'আর মধ্যে পার্থক্য কি থাকল? মূলতঃ এটাকে দু'প্রকারে বিভক্ত করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দু'আর উপর্যুক্ত দু'প্রকারকে তখনই মেনে নেয়া যেত যদি উভয় দু'আর ভিন্নতার সাথে সাথে হুকুমও ভিন্ন হতো। কোন বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করার পর যদি উক্ত বিভক্তির মাধ্যমে হুকুমগত কোন পার্থক্য পাওয়া না যায় তাহলে উক্ত বিভক্তি অনর্থক হয়ে যায়। এটাকে আমরা নিম্নোক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝতে পারি। **উদাহরণ ঃ** সিজদা দু' প্রকার।

(১) سجده عبادت **(ইবাদাতের নিয়তে সিজদা)**

(২) سجده تعظیم **(সম্মানসূচক সিজদা)**

সিজদার উক্ত দু'প্রকারের মধ্যে সিজদায়ে তা'যীম সিজদায়ে ইবাদাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। আর অন্তর্ভুক্ত করাটা সম্পূর্ণ ভুল। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে হুকুমের দিক থেকেও বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যদি কোন বান্দার সামনে ইবাদাতের নিয়তে সিজদা করা হয়,তাহলে তা শিরক হবে। আর যদি কেবল সম্মানের উদ্দেশে সিজদা করা হয়, তখন তা শিরক নয় বরং হারাম।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ অনুরূপ আরেকটি উদাহরণ দেখুন- কালিমা (শব্দ) তিন প্রকার (১) ইস্ম (বিশেষ্য) (২) ফে'ল (ক্রিয়া) (৩) হরফ (অব্যয়)। এ তিন প্রকার কালিমা পরস্পর ভিন্ন। এগুলোর একটিকে অপরটির স্থলে ব্যবহার করা কোনমতেই বৈধ নয়।

দু'আর অর্থ শুধুমাত্র ইবাদাত নেওয়া অযৌক্তিক

তাদের দাবী হচ্ছে دعا শব্দটি শুধুমাত্র দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটাও কখনো সঠিক নয়। কেননা দু'আর আটটি অর্থ ইতোপূর্বে বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। যদি দু'আর অর্থ কেবল ইবাদাত নেয়া হয় এবং দু'আয়ে সুওয়ালকে দু'আয়ে ইবাদাতের মধ্যে গণ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা হয়,তাহলে সারা বিশ্ব শিরকের জলাশয়ে ডুবে যাবে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কিরামও (মায়াযাল্লাহ) তা থেকে রেহাই পাবেন না।

নিঃসন্দেহে দু'আ (আহবান করা) সর্বক্ষেত্রে ইবাদাতের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। নতুবা কেউই শিরক থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে না। কেননা খোদ কুরআনের বর্ণনাই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সারওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও গায়রুল্লাহকে আহবান করেছেন। স্বয়ং কুরআনও একে অপরকে আহবান করার অনুমতি দিচ্ছে। যদি সর্বক্ষেত্রে دَعَا — يَدْعُوْ — نَدْعُوْ — تَدْعُوْ এর অর্থ শুধুমাত্র দু'আয়ে ইবাদাত অথবা দু'আয়ে সুওয়াল (যা কিছু লোকের কাছে দু'আয়ে ইবাদাতের প্রতিচ্ছবি মাত্র) গ্রহণ করা হয়,তাহলে নিম্নবর্ণিত আয়াত সমূহের কি ব্যাখ্যা হবে?

(১) يَاقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ

- "হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো দোযখের দিকে!" (সূরা মু'মিন ; ৪০ ঃ ৪১)

(২) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِيْ اِلَّا فِرَارًا

-" আরয করলো, হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে রাত-দিন আহবান করেছি; সুতরাং আমার আহবান থেকে তাদের পলায়ন করাই বৃদ্ধি পেয়েছে।" (নূহ , ৭১ ঃ ৫, ৬)

(৩) وَاللهُ يَدْعُوْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ

- "এবং আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন।" (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৫)।

(৪) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ

- "তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়েই ডাকো, এটা আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত।" (আল আহযাব, ৩৩ ঃ ৫)

(৫) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

-"এখন আহবান করুক আপন মজলিসকে! এখনই আমি সৈন্যদেরকে আহ্বান করছি।" (আল আলাক, ৯৬ ঃ ১৭, ১৮)

(৬) فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

-" তখন তারা তাদেরকে আহবান করবে। তারা তাদেরকে জবাব দেবে না।" (আল কাহফ, ১৮ ঃ ৫২)।

(৭) يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

-" যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের ইমাম (নেতা) সহকারে আহবান করবো।" (বানী ইসরাঈল, ১৭ ঃ ৭১)

(৮) وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى

- "আর যদি আপনি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহবান করেন।"(আল কাহফ, ১৮ ঃ ৫৭)

সূরা ফাতিহা এবং সাহায্য প্রার্থনার বিধান

সূরা ফাতিহায় যেমন ইসলামের অনেক আক্বাইদ ও শিক্ষার ধারণাকে খোলাসা করা হয়েছে.তেমনি সাহায্য প্রার্থনার বিধানকেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

-"আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" (আল্ ফাতিহা, ১ ঃ ৪)

এ পবিত্র আয়াতটি 'সাহায্য প্রার্থনার' মাসআলার মূল ভিত্তি। যাতে ইবাদাত ও ইস্তিআনাকে পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াত করীমার প্রথম অংশ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ইসলামের ইবাদাতের বিধান এবং দ্বিতীয় অংশ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ" সাহায্য প্রার্থনার বিধানকে সুস্পষ্ট করছে। এটাই সে আয়াতে মুবারাকা যার বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভ্রান্ত ধারণার মাধ্যমে কিছু লোক সকল মুসলিম উম্মাহ্র উপর শিরকের ফতোয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

মূলতঃ এ আয়াতের বাহ্যিক পঠনের মাধ্যমে তাদের মনে এ ধারণার জন্ম হয়েছে যে, আয়াতের উভয় অংশে অভিন্ন অর্থবোধক শব্দ এসেছে। প্রথম অংশে এসেছে ইবাদাতের বর্ণনা। যা শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ইস্তিআনার বর্ণনা।

একই ধরনের শব্দ ব্যবহারের কারণে অভিন্ন হুকুম প্রতিষ্ঠিত হওয়া বোধগম্য নয়। তারা এখানে আয়াতের মাধ্যমে বাহ্যিক হালকাভাবে দলীল গ্রহণ করে নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছে। সাহায্য প্রার্থনাকেও ইবাদাতের মতোই শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি আমরা উক্ত আয়াতে করীমা গভীরভাবে অধ্যয়ন করি.তাহলে দেখতে পাব বাস্তবতা এর বিপরীত। দেখতে একই রকম শব্দ আসলেও আয়াতে করীমার উভয় অংশের মাঝখানে হরফে আতফ কোন বাস্তবতার দিকে নির্দেশ করে? যদি ইবাদাত ও ইস্তিআনা উভয়ের হুকুম একই হতো তাহলে উক্ত বাক্যদ্বয়ের মাঝখানে আল্লাহ্ তায়ালা কখনো واو বৃদ্ধি করতেন না। এ واو আসার কারণেই তার পূর্বের ও পরের হুকুমের মধ্যে ভিন্নতা স্পষ্ট হয়েছে।

দুটি বাক্যের মাঝখানে থাকা ভিন্নতা নির্দেশক হরফের কারণে বাক্যদ্বয়ের আহকাম তথা বিধানের পার্থক্য বুঝা যাচ্ছে। যদি اياك نستعين এর মধ্যে সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা আল্লাহর ইবাদাত উদ্দেশ্য হতো তাহলে কুরআন মাজীদ এটাকে واو হরফে আতফের মাধ্যমে إِيَّاكَ نَعْبُدُ থেকে আলাদা করতো না। হরফে আতফ واو এর ব্যবহার এটাই বলছে যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ ও إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ উভয়ের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। যদি ইবাদাত ও ইস্তিআনার বিধান একই হতো.তাহলে এ দুটির মাঝখানে ভিন্নতা নির্দেশক হরফে আতফ واو আনার প্রয়োজন ছিল না। বরং বাক্যটি হতো এমন إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ।

কুরআন মাজীদ আল্লাহ তায়ালার বাণী হওয়ায় স্বীয় অনুপম বৈশিষ্ট্য, ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার কারণে মানুষের সমালোচনার উর্ধে। এর প্রতিটি হরফের নির্দিষ্ট অর্থ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। একটি হরফও অপ্রয়োজনীয় বলা যাবে না। তাই যদি আলোচ্য আয়াতে ইবাদত ও ইস্তিআনার মধ্যকার ভিন্নতা উদ্দেশ্য না হতো.তাহলে ভিন্নতা নির্দেশক হরফ কখনোই আনা হতো না। কুরআন মাজীদে এর সমর্থনে যথেষ্ট উদাহরণ এসেছে। তেমনিভাবে যেখানে ভিন্নতা উদ্দেশ্য নয় সেখানে واو নেয়া হয়নি। এর উদাহরণ সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াতেই দেখা যায়। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র বাণী-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর; পরম দয়ালু, করুণাময়; প্রতিদান দিবসের মালিক।" (আল ফাতিহা, ১ ঃ ১-৪)

আপনারা দেখলেন যে, ধারাবাহিকভাবে প্রথম তিনটি আয়াতেই আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর নামের পরে আল্লাহ তায়ালার চারটি গুণের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাঝখানে কোন ধরনের ভিন্নতা না থাকায় কোথাও হরফে আতফ واو নেয়া হয়নি। যদিও অন্যান্য আয়াতসমূহে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন আমল ও কাজের উদ্দেশ্য ছিল সেখানে واو হরফে আত্ফ নেয়া হয়েছে।

সুতরাং প্রতিভাত হলো, দু'আ এবং ইস্তিআনা ও ইস্তিগাছা দুটি পরস্পর ভিন্ন বিষয়। এবং এগুলো একটি অপরটির স্থলে ব্যবহার বা সংমিশ্রণের চেষ্টা হচ্ছে কুরআন অবতরণের দাবীর পরিপন্থী কাজ। যা কোন মতেই বৈধ নয়। ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মানবীয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীলতা পথভ্রষ্টতার জন্ম দেয়। বিভিন্ন দার্শনিক যুক্তির জালে আটকে পড়া ব্যক্তিরা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরেই থেকে যায়। অন্যকেও বিভ্রান্তির কাদায় ডুবিয়ে দেয়। নিজের বিবেককেও ভ্রান্ত ধারণার আখড়া বানিয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অর্থহীন ভুবন সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাজেদারে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে সাহায্য প্রার্থনার বিধান

বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা অনুযায়ী ইস্তিআনা, ইস্তিমদাদ, ইস্তিগাছা, সুওয়াল, প্রার্থনা ও আহবানের ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র সত্ত্বাই হাকীকী সাহায্যকারী। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, 'আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে দেবো।'

যদি কেউ কুরআন মাজীদের এ মৌলিক শিক্ষা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এ আকীদা পোষণ করে যে, সৃষ্টি জগতের কেউ আল্লাহ তায়ালার অনুমতি কিংবা সাহায্য ছাড়া নিজ ইচ্ছায় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক তবে তা অকাট্যভাবে শিরক। চাই ঐ সাহায্য প্রার্থনা কোন কার্যকারণের মাধ্যমে হোক বা কোন কার্যকারণ ছাড়াই হোক। উভয় ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মুশরিক বলে গণ্য হবে।

যখন এর বিপরীতে অন্যভাবে প্রকৃত সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত ও জবাবদাতা আল্লাহ তায়ালাকে মনে করে কোন বান্দা কোন কাজের জন্য বান্দার দ্বারস্থ হয়, যেমন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করে, কিংবা ঝাঁড়-ফুঁক ও দু'আ দুরুদের জন্য আল্লাহ তায়ালার কোন নেক্কার বান্দার কাছে যায় তাহলে তা কখনোই শিরক নয়। বরং তার এ কাজ চিরন্তন সামাজিক রীতির অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালাম মাজীদে বহুবার মু'মিনদেরকে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

- "এবং সৎ ও খোদা ভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো আর পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করো না"। (আল মায়িদাহ্ ৫ ঃ ২)

উক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ তায়ালা সকল মুসলমানকে পরস্পর সাহায্য সহযোগীতার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এটা সুস্পষ্ট যে, পরস্পর সাহায্য সহযোগীতা তখনই সম্ভব, যখন কোন দুর্দশাগ্রস্ত মু'মিন অপর সুখী সচ্ছল মুমিনের কাছে সাহায্য চায়।

নিঃসন্দেহে এ ইস্তিমদাদ ও ইস্তিগাছা প্রাকৃতিক বিষয়াদিতে যেমন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের অধীন তেমনি রূহানী তথা আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও । তদ্রুপ কার্যকারণের অধীন ও কার্যকারণের উর্ধ্বে উভয় প্রকার বিষয় এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পারস্পরিক সহযোগীতার নির্দেশকে মুতলাক তথা শর্তহীন রেখেছেন।

আর কায়িদা (মূলনীতি) হচ্ছে কুরআন মাজীদের শর্তহীন কোন বিষয়কে কোন খবরে ওয়াহিদ কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে মুকায়য়াদ (শর্তযুক্ত) করা বৈধ নয়। এখানে কোন ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সহযোগীতাকে (Mutual Cooparation) কার্যকারণের শর্ত লাগিয়ে মুকায়য়াদ করতে চায় তাহলে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা বিরোধী কাজই হবে।

ইসলামী আহকাম ও শিক্ষার আলোকে পারস্পরিক সহযোগীতার নির্দেশ কুরআন শরীফের পবিত্র আয়াত ও বরকতময় হাদীস সমূহে যথেষ্ট বিদ্যমান। যাতে এটা প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া হয় সে যেন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে এবং যাকে আহবান করা হয় সে যেন তার আহবানে সাড়া দেয় ও দুঃখী মানুষের দুর্দশা মোচন করে।

'সাহায্য প্রার্থনার' বৈধতা সম্পর্কে অসংখ্য স্থানে পবিত্র কুরআন শরীফের হুকুম বিদ্যমান। তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা এমনভাবে বৈধ যেমন সাইয়িদুনা মূসা (আঃ)-এর কাছে জনৈক কিবতী এক যালিমের বিপক্ষে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। তখন মূসা (আ.) ও তাকে সাহায্য করেছিলেন। আল্লাহ্র নবীগণের (আ.) চেয়ে বড় তাওহীদপন্থী কে আছেন? যাঁদের সারা জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাওহীদের বাণীকে সমগ্র বিশ্বে পৌছে দেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা কিবতী ও নবী (আ.) কাউকেই সাহায্য প্রার্থনা করার কারণে মুশরিক বলেন নি। আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ -

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ —

-"তখন ঐ লোক যে তাঁর দলের ছিলো সে মূসার নিকট সাহায্য চাইলো তাঁরই বিরুদ্ধে যে তাঁর শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।" (আল্ কাসাস, ১৫ ঃ ২৮)

এছাড়াও কুরআন মাজীদের বহু স্থানে পূর্বেকার উম্মতের মুমিনগণ কর্তৃক তাদের নবীও নেক্কার ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার বর্ণনা রয়েছে। মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতের মধ্যে বিশেষতঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও এর উপর আমল প্রচলিত ছিল। অভাবীকে সাহায্য ও পরস্পর দুঃখ দুর্দশা দূর করা সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে।

হাদীস শরীফ ও সাহাবায়ে কিরামের আমলের আলোকে 'সাহায্য প্রার্থনা'

কারো বিপর্যয়ের সময় সহায়তা করা, দুঃখের সময় পাশে থাকা তার প্রতি ভালবাসার গভীরতার পরিচায়ক। ইসলাম নিরাপত্তা ও শান্তির দাওয়াত দেয়। তাজেদারে আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র হায়াতের প্রতিটি মুহূর্তই ভালবাসার সৌরভে সুরভিত। তায়িফের দুষ্ট বালকদের পাথর নিক্ষেপের সময়ও তাঁর পবিত্র ওষ্টে শোভা পায় দু'আর পুষ্প। রক্ত পিপাসুদের মধ্যেও দয়া, করুণা, ক্ষমা ও উদারতার পরম পরাকাষ্টা প্রদর্শনকারী সরকারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বীন মূলত ভালবাসার উজ্জল দৃষ্টান্ত। দুঃখ-ব্যথা দূরীভূতকরণ এবং প্রয়োজন পূরণে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে বড় ওয়াসীলা ও মাধ্যম আর কে হতে পারেন?

কিয়ামতের দিন যখন মানুষের উপর সবচেয়ে কঠিন সংকট আপতিত হবে, সকলে 'ইয়া নাফসী' 'ইয়া নাফসী' করতে থাকবে। মানুষ সাহায্য ও শাফায়াতের আশায় আম্বিয়া (আঃ) ও সৎকর্মশীল বান্দাদের দ্বারস্থ হবে। কিন্তু সেদিন সকল আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম) মুখ ফিরিয়ে চলে যাবেন। তখন সকলেই সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ওয়াসীলা বানিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ্ তায়ালা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলায় মানুষকে সে কঠিন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিবেন।

হাদীসে মুবারাকে তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,সকল মানুষ প্রথমে সাহায্যের জন্য হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে যাবে। এরপর যাবে সাইয়িদুনা মূসা (আঃ) এর কাছে। সর্বশেষ খাতামুল মুরসালীন সাইয়িদুনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ইস্তিগাছা করবে। হাদীসের শব্দগুলো নিম্নরূপ-

اِسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ، ثُمَّ بِمُوْسٰى ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم (صحيح البخاري، كتاب الزكوة 199:1)

-"লোকেরা আদম (আঃ)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। এরপর মূসা (আঃ)-এবং সর্বশেষ তাজেদারে আম্বিয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে।" (সহীহুল বুখারী, যাকাত অধ্যায় ১ঃ১৯৯)

সহীহ বুখারী শরীফে ইস্তিগাছা শব্দ সম্বলিত উক্ত হাদীসের বর্ণনার দ্বারা استغاثة শব্দের উক্ত অর্থে ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষ কর্তৃক সৎকর্মশীল ও আম্বিয়া (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, সাহায্য প্রার্থনার অনুমতি পরকালীন জীবনে স্বীকৃত এবং যে ইস্তিআনা ও ইস্তিগাছা পার্থিব জীবনে জীবিত মানুষের কাছে করা বৈধ, কবর জীবনে উক্ত সাহায্য প্রার্থনার বৈধতার উপর শিরকের অপবাদ কোন অর্থের ভিত্তিতে দেয়া হচ্ছে?

হাদীস শরীফ সমূহে বিভিন্ন জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বি) খাতামুন্ নাবিয়্যীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। তাদের দারিদ্র্য, রোগ,বিপদ, অভাব, কর্জ ও অক্ষমতা ইত্যাদি অবস্থার উল্লেখ ও তাকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করে প্রাত্যহিক জীবনের উক্ত সমস্যাবলী দূরীকরণের আবেদন করতেন। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এ সুপ্ত আকীদা ছিল যে, সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবলমাত্র একজন মাধ্যম এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের কার্যকারণ। মৌলিক সম্পাদনাকারী শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র সত্ত্বা।

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বরকতময় হাদীস উল্লেখ করছি যাতে সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বি) হুযূর সরওয়ারে দু আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ইস্তিগাছা করেছেন।

সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাহায্য প্রার্থনা

সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর স্মৃতিশক্তি প্রথম দিকে খুবই দুর্বল ছিল। তিনি সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহামূল্যবান বাণীগুলো মুখস্থ

রাখতে পারতেন না। এমতাবস্থায় একদিন তিনি হুযূর রাহমাতুল্লিল আলামীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমীপে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বিস্মৃতিকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিলেন। এর ফলে তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম হয়ে গেলেন। সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাদ্বি) নিজেই তাঁর এ হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন-

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاهُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْسُطْ رِدَاءَكَ ، فَبَسَطْتُهُ ، قَالَ : فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ضُمَّ فَضَمَمْتُهُ ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدُ ـ

- "আমি আরজ করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আপনার অনেক হাদীস শুনি কিন্তু পরক্ষণেই তা ভুলে যাই। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তোমার চাদরটি বিছিয়ে দাও। আমি বিছিয়ে দিলাম। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (শূন্য থেকে) নিজ হাতে কিছু একটা নিয়ে চাদরে ঢেলে দিলেন। এরপর বললেন, চাদরটি তোমার গায়ে জড়িয়ে নাও। আমি চাদরটি গায়ে জড়ালাম। উক্ত ঘটনার পর থেকে আমি কখনো কোন কিছুই ভুলে যাইনি।" (সহীহুল বুখারী, ইলম অধ্যায়, ১ ঃ ২২)
(সহীহুল বুখারী, সাওম অধ্যায়, ১ ঃ ২৭৪)

সহীহ বুখারী শরীফের উক্ত বরকতময় হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাদ্বিঃ) রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সব রকম সমস্যার সমাধানের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সাহাবায়ে কিরামের (রাদ্বিঃ) চেয়ে বড় তাওহীদপন্থী আর কে আছে? নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়ে বড় তাওহীদের আহ্বানকারী কে হতে পারেন? তা সত্ত্বেও সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাদ্বিঃ) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও বাধা প্রদানের পরিবর্তে তার সমস্যা আজীবনের জন্য সমাধান করে দিলেন। কারণ একত্ববাদে বিশ্বাসী সকলেই জানে যে, প্রকৃত 'সাহায্য প্রার্থনা'র উপযুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। আম্বিয়া, আউলিয়া, সুলাহা প্রমুখ উম্মতের সম্মানিত বান্দাগণ যাদের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তাঁরা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কেবল কারণ ও মাধ্যম হয়ে থাকেন। তাদের সকল তাসাররুফ আল্লাহ তায়ালারই প্রদত্ত। তাঁরা মানুষের ইপ্সিত বস্তু লাভের জন্য আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে মাধ্যম ও ওয়াসীলা হয়ে থাকেন।

সাইয়িদুনা আবূ হুরায়রা (রাদ্বি) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তার প্রয়োজন পূরণ করে দিলেন। তিনি তাকে এ বলে ফিরিয়ে দেননি যে, যাও আল্লাহর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাছে দু'আ করো এবং তাওহীদের উপর অটল থাকো। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শূন্য থেকে মুঠো ভরে অদৃশ্য বস্তু নিয়ে তাঁর চাদরে ঢেলে দিলেন। আর নির্দেশ দিলেন, এটা তোমার বুকের সাথে জড়িয়ে নাও। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর প্রয়োজন পূরণে এ কাজটাকে ওয়াসীলা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

প্রত্যেক সচেতন তাওহীদে বিশ্বাসী লোক জানে যে, প্রয়োজন ও মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা শুধুমাত্র তার কাছেই করা হয় যার কুদরতী হাতে রয়েছে জগতের সমস্ত ইখতিয়ার। যখন ওয়াসীলা অন্বেষণকারীর বিশ্বাস এটা হয় যে, ওয়াসীলা এবং শাফায়াতকারী ব্যক্তি আমি গুনাহগারের চেয়ে আল্লাহ্ তায়ালার অধিক নৈকট্য প্রাপ্ত এবং তাঁর মর্যাদা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশী, তখন সাহায্য প্রার্থী তাকে মুস্তাগাছে মাজাযীর চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না। কেননা সে জানে, প্রকৃত সাহায্যকারী শুধুমাত্র মহান আল্লাহ। এ বিষয়টি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

সাইয়িদুনা কাতাদাহ ইবনে নু'মানের (রাঃ) সাহায্য প্রার্থনা

বদর যুদ্ধে সাইয়িদুনা কাতাদাহ ইবনে নু'মানের (রাঃ) একটি পবিত্র চোখ নষ্ট হয়ে যায়। চোখের গোলক কোটর থেকে বেরিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়ে। ব্যথা ও কষ্টের তীব্রতার কথা বিবেচনা করে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাকে পরামর্শ দিলেন, চোখের রগটা কেটে দিন। এতে ব্যথা কিছুটা কমবে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) সঙ্গীদের পরামর্শমত কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে প্রথমে সমগ্র বিশ্বের মহান কল্যানকারী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে তার অবস্থা বর্ণনা পূর্বক সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সরওয়ারে আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চোখের রগ কর্তনের অনুমতি দানের পরিবর্তে নিজ পবিত্র হাতে চোখটিকে পুনরায় পূর্বের স্থানে রেখে দিলেন। এতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন আমার নষ্ট হয়ে যাওয়া চোখের দৃষ্টিশক্তি পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী। ইস্তিগাছার এ হাদীস ইমাম বায়হাকী (রাঃ) দালাইলুন্ নুবুওয়াত গ্রন্থে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন-

عَنْ قَتَادَةَ ابْنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ بَدْرٍ فَسَالَتْ حَدَقَتُهُ عَلَى وَجْنَتِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا ، فَدَعَا بِهِ ، فَغَمَزَ حَدَقَتَهُ بِرَاحَتِهِ ، فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيُّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ .

- "সাইয়িদুনা কাতাদাহ ইবনে নু'মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত বদরের যুদ্ধের সময় তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। অক্ষিগোলক বেরিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়ে।

সাহাবীগণ (রাঃ) তা কেটে ফেলার ইচ্ছা করলেন। যখন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি নিষেধ করলেন এবং দু'আ করলেন এরপর চোখটিকে দ্বিতীয়বার পূর্বের স্থানে রেখে দিলেন। তৎক্ষণাত হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এর চোখ এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলো যে, কোন চোখটি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল তাও বুঝা যাচ্ছিল না।"

(মুসনাদে আবূ ইয়ালা, ৩ঃ১২০)
(দালাইলুন নুবুওয়াত, ৩ঃ১০০)
(তাবাকাতে ইবনে সাদ,১ঃ১৮৭)
(তারীখে ইবনে কাছীর,৩ঃ২৯১)
(আল ইছাবাহ ফী তাময়িজিস্ সাহাবাহ ৩ঃ২২৫)

ফোড়া আক্রান্ত সাহাবীর সাহায্য প্রার্থনা

পবিত্র হাদীস গ্রন্থ সমূহে মহান চিকিৎসক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক এক ফোড়া আক্রান্ত সাহাবীর সাহায্যের কথাও বর্ণিত রয়েছে। জনৈক সাহাবীর (রাদ্বিঃ) হাতে ফোড়া হয়েছিল। যার কারণে তিনি যুদ্ধের সময় ঘোড়ার লাগাম ও তলোয়ার ধরতে পারতেন না। তখন উক্ত সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন এবং এ রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তখন প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র হাতের মাধ্যমে ঐ সাহাবীকে আরোগ্য দান করলেন। এ হাদীস খানা 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে-

اتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وبكفى سلعة ، فقلت ، يا نبى الله ! هذا السلعة قد أورمتنى لتحول بينى وبين قائم السيف أن أقبض عليه وعن عنان الدابة - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أُدْنُ مِنِّيْ— فَدَنَوْتُ ، فَفَتَحَهَا ، فَنَفَثَ فِي كَفِّي ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى السَّلْعَةِ، فَمَازَالَ يَطْحَنُهَا بِكَفِّهِ حَتَّى رَفَعَ عَنْهَا وَمَا أرى أثرَهَا.

- "আমি রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার হাতে একটি ফোঁড়া হয়েছিল। আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার হাতে ফোড়া হয়েছে। যার কারণে সওয়ারীর লাগাম ও তরবারী ধরতে আমার কষ্ট হচ্ছে। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমার কাছে আসো'। আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফোড়াটি (পট্টি সরিয়ে) অবমুক্ত করলেন এবং হাতে ফুঁক দিলেন। এরপর তাঁর পবিত্র হাতটি ফোড়ার উপর রেখে চাপ দিতে লাগলেন। যখন হাত তুললেন, তখন সেখানে ফোড়ার কোন চিহ্নও দেখা গেলো না।" (মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ৮ঃ২৯৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্ধ সাহাবীর (রাঃ) সাহায্য প্রার্থনা

জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তির মহান নি'মাত দিয়ে ধন্য করা সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-এর মু'জিযা। বর্ণিত আছে, জনৈক অন্ধ সাহাবী (রাঃ) সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে আকদাসে দৃষ্টিশক্তি লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে আসলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বাধা প্রদান, সাহায্য প্রার্থনার অবৈধতা বা শিরক হওয়ার কথা না বলে তাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিলেন। এ দু'আ তাঁর ওয়াসীলা ও ইস্তিগাছা বৈধ হওয়ার প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উক্ত অন্ধ সাহাবীর (রাঃ) ইখলাসের সাথে করা উক্ত আমলটি আজও দুঃখী মানুষের জন্য পরীক্ষিত বিষয়। উক্ত দু'আটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ ! اِنِّىْ قَدْتَوَجَّهْتُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ فَتَقْضِىْ لِىْ ، اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِىَّ .

-"হে আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আমার চেহারা আপনার দিকে ফিরাচ্ছি, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার মাধ্যমে আমার রবের মুখাপেক্ষী হলাম, যাতে আমার এ প্রয়োজন পূরণ হয়। হে আল্লাহ, আমার ব্যাপারে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ কবুল করুন।" - (জামিউত্ তিরমিযী, আব ওয়াবুদ্ দাওয়াত, ২ঃ১৯৭)
(মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ৪ঃ১৩৮)
(আল মুসতাদরাক, ১ঃ৩১৩,৫১৯,৫২৬)

আপনারা লক্ষ করেছেন, পবিত্র হাদীসের প্রথম বাক্যটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে ওয়াসীলা হিসেবে উপস্থাপন করছে। এমনকি এ দু'আর দ্বিতীয় বাক্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দু'আ কবূলের জন্য কেবল ইস্তিগাছার বৈধতা নয় বরং নির্দেশই দেখা যাচ্ছে। যদি আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কোন মাখলুকের কাছে ইস্তিগাছা করা বৈধ ও সঠিক না হতো তাহলে নবী করীম রাউফুর রাহীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করার নির্দেশ দিতেন না।

সৃষ্টি জগতের সব চেয়ে বড় একত্ববাদী যখন নিজেই ইস্তিগাছার হুকুম দিলেন তখন তাওহীদকে নির্ভেজাল করার নামে ইসলামের মৌলিক আকীদা, দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশ্বের সকল মুসলমানকে কাফির ও মুশরিক ফতোয়া দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে কি?

জনৈক সাহাবীর বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনা

পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার প্রমাণ এবং সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) আমল দ্বারা এর বৈধতার দলীলে ভরপূর। বিভিন্ন সহীহ,মারফূ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যখনই কোন বিপদাপদে পতিত হতেন তখন সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যেতেন। আল্লাহ তায়ালার সমীপে তাকে ওয়াসীলা বানিয়ে দুআ করতেন। প্রয়োজন পূরণের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যার ফলে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত তাদের সমস্যা দূর করতেন।

সাইয়িদুনা আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'হাদীসে ইসতিসকা (বৃষ্টি প্রার্থনা)' কে সহীহ হিসেবে গণ্য করে ইমাম বুখারী (রাঃ)-এভাবে বর্ণনা করেন,

عن انس ابن مالك رضى الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذا جاء رجل فقال ,, يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر فادع الله أن يسقينا ،، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل الى منازلنا تمطر الى الجمعة المقبلة — قال ,, فقام ذلك الرجل أو غيره , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ادع الله أن يصرفه عنا ،، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ،، قال : فلقد رأيت السحاب يقتطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر اهل المدينة .

-"সাইয়িদুনা আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক এসে বললো "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এখনতো অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালার কাছে বৃষ্টির জন্য দু'আ করুন।" হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করলেন। ফলে আমরা জুমু'আর নামায আদায় করে ঘরে ফেরার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হলো। তা অব্যাহত ছিল পরবর্তী জুমুআর দিন পর্যন্ত। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, পরের জুমুআয় ঐ লোক বা অন্য একজন দাঁড়িয়ে আরজ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'আ করলেন," হে আল্লাহ, আমাদের আশে পাশে (অন্য কোথাও) হোক; আমাদের উপর নয়।"এরপর আমি দেখতে পেলাম বৃষ্টি বর্ষণের সময়েই মেঘমালা ডানে-বাঁয়ে সরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

গেল। মদীনাবাসীদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইস্তিসকা, ১ ঃ ১৩৮)

সাহাবারে কিরামের (রাঃ) আমল দ্বারা ইস্তিসকার প্রমাণ এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামকে (রাঃ) এ আমল থেকে বাধা দানের পরিবর্তে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা একথা প্রমাণ করে যে, এ আমল শিরকের ন্যূনতম সম্ভাবনা থেকেও মুক্ত। কোন সাহাবী শিরকে লিপ্ত হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি এটাতো একেবারেই অসম্ভব যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদেরকে শিরক থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা না দেওয়া।

সাইয়িদুনা আমীর হামযা (রাঃ) দুঃখ মোচনকারী

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচা সাইয়িদুনা হামযা (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর এমনভাবে কেঁদেছেন যে, আর কখনো তাঁকে এত বেশী কাঁদতে দেখা যায়নি। সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জানাযাকে কিবলামুখী রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এমনকি তার হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেল। এরপর সাইয়িদুনা আমীর হামযা (রাঃ) কে সম্বোধন করে বললেন,

يا حمزة ! يا عم رسول الله ! وأسد الله ! وأسد رسوله ! يا حمزة ! يا فاعل الخيرات ! يا حمزة ! يا كاشف الكربات ! يا ذاب عن وجه رسول الله !

- "হে হামযা! হে আল্লাহ্‌র রাসূলের চাচা! ওহে আল্লাহ্‌র সিংহ! ওহে রাসূলুল্লাহর সিংহ! হে হামযা! হে দুঃখ মোচনকারী! হে রাসূলুল্লাহ্‌র চেহারাকে রক্ষণাবেক্ষণ কারী!"
(আল মাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যাহ্, ১ ঃ ২১২)

উক্ত পবিত্র হাদীসে ওফাত প্রাপ্ত মানুষকে 'ইয়া' (হে) বলে সম্বোধন করার বৈধতা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক উচ্চারিত 'ইয়া কাশিফাল কুরুবাত' কথাটি ও গবেষণার অবকাশ রাখে।

উপর্যুক্ত কথাগুলো উচ্চারণ করে সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালিহীনের (সৎকর্মশীল বান্দা) কাছে সাহায্য প্রার্থনাকে শুধু বৈধ করেন নি বরং যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তার পক্ষ থেকে সাহায্য আসাটাও সত্য ও স্বাভাবিক বলেছেন। এ কারণেই তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাইয়িদুনা

আমীর হামযাকে (রাঃ) দুঃখ মোচনকারীর মত সুন্দর শব্দাবলী দ্বারা আহবান করেছেন। এখানে সাইয়িদুনা আমীর হামযা (রাঃ) সাহায্যকারী হওয়া রূপক অর্থে। কেননা প্রকৃত সাহায্যকারী কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাইয়িদুনা আমীর হামযা (রাঃ) কে সাহায্যকারী বলা, ওফাতের পর তাকে ইয়া বলে আহবান করা এটাই প্রমাণ করে যে, সাহায্য প্রার্থনা হাক্বীক্বি (প্রকৃত) ও মাজাযী (রূপক) এ দু' অর্থে ব্যবহৃত হওয়া শরীয়ত সমর্থিত। নতুবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও অনুরূপ কাজ করতেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

মৃত্যুর পর সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা

সাহায্য প্রার্থনার বৈধতা সম্পর্কিত কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সকল বিধি-বিধান এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল ভালভাবে জানার পরও কিছু লোক এ ধারণা পোষণ করে যে, পার্থিব জীবনে যেহেতু একে অপরের উপকার করা সম্ভব তাই সাহায্য চাওয়া ও সাহায্য করা দুটোই বৈধ। কিন্তু মৃত্যুর পর বান্দা যেখানে নিজেই অসহায় হয়ে যায় সেখানে তার কাছে কিভাবে সাহায্য চাওয়া যাবে? যেহেতু সে কাউকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না তাই সাহায্য চাওয়া শিরক।

একথাটি নিঃসন্দেহে তাদের স্থূলবুদ্ধির পরিচায়ক। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিশেষভাবে দুটি বিষয়কে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবো।

প্রথম কথা হচ্ছে, এটা সর্বজনবিদিত যে, বান্দা জীবিত থাকুক বা কবরে বিশ্রামে থাকুক কোন অবস্থাতেই সে তার অস্তিত্বের উপর নিজস্ব ক্ষমতার অধিকারী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। যাকে আমরা পার্থিব জীবনে ব্যবহার করছি। পৃথিবীর সকল কাজ-কর্ম, লেনদেন করার সুযোগ পাচ্ছি। এ স্বাধীনতা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের দান।

আল্লাহ্ তায়ালা যদি এ পার্থিব জীবনেই তার প্রদত্ত ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন তাহলে বান্দা একটি তৃণ ছেঁড়ার শক্তিও রাখবে না। তাই যেভাবে কার্যকারণের ভিত্তিতে পরিচালিত এ পৃথিবীতে বান্দার সকল ক্ষমতার প্রকৃত মালিক আল্লাহ তায়ালা এবং তা সত্ত্বেও কারো কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক নয় বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশ তদ্রুপ একইভাবে মৃত্যুর পরও যদি কোন মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তখন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকেই ক্ষমতাবান মনে করা হবে। জীবিত অবস্থায় যেমন কোনভাবেই বান্দাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাক্বীক্বি (প্রকৃত) মুস্তাগাছ (সাহায্য চাওয়ার উপযুক্ত) ও মুখতার (স্বাধীন) মান্য করা শিরক কিন্তু মাজাযী হিসেবে তাকে সাহায্যের জন্য আহবান করা বৈধ অনুরূপভাবে মৃত্যুর পরও অলি ও সালিহগকে মাজাযী মুস্তাগাছ মনে করে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয।

যা শিরক তা জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্যই শিরক। মাজাযী তথা রূপক মালিক মনে করে সাহায্য প্রার্থনা জীবিত হোন বা মাজার ওয়ালা হোন কারো কাছেই শিরক হবে না। ইসলামের বিধানে কোন বৈষম্য নেই। এমন নয় যে, একটি কাজ মসজিদে করলে শিরক নয় কিন্তু মন্দিরে গিয়ে করলে তা শিরক।

ইসলামের বিধি-বিধান ও তার ফলাফল সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন হয়ে থাকে। তাই যদি কোন ডাক্তারকে প্রকৃত মুস্তাগাছ মনে করে তার কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয় তাহলে তা শিরক হবে।

অপরদিকে যদি আল্লাহ তায়ালাকে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করে কোন বুযুর্গের দুআ কিংবা কোন মাজার ওয়ালার ওয়াসীলাকে চিকিৎসার মাধ্যম বানানো হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে সঠিক। কখনোই ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী নয়।

এখন বাকী থাকলো এ অভিযোগ যে, কবরবাসীদের কাছে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকে না। এটাও ভ্রান্ত ধারণা। কেননা আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে আহলুল্লাহ তথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কবরের জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন।

শহীদদের হায়াত সম্পর্কে তো কোন পথ ও মতের অনুসারীদের মধ্যেই মতপার্থক্য নেই। যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন সাধারণ উম্মত শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত এবং তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রিয্ক পাঠানো হয় সে নবী করীম(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের জীবনের বাস্তবতা কেমন হতে পারে?

সুতরাং ওফাত পরবর্তী জীবনের আকীদার ভিত্তিতে সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মাজাযী মুস্তাগাছ মনে করে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এমনভাবে বৈধ যেমন তার পবিত্র জাহেরী (প্রকাশ্য) হায়াতের মধ্যে বৈধ ছিল।

এমনকি তাঁর কবরের জীবনের বাস্তবতা হলো, উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি দুরূদ ও সালামের যে উপঢৌকন পাঠানো হয় তা দিবানিশি তাঁর দরবারে পৌছানোর জন্য একদল ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন।

যদি শাফাআত প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা ও ওয়াসীলা গ্রহণ কুফর ও শিরকের পর্যায়ভুক্ত হতো তাহলে পৃথিবীতে, কবরের জীবনে এবং পরকালে সর্বক্ষেত্রেই তা কুফর ও শিরক হওয়াই যৌক্তিক ছিল। কেননা শিরক সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র অপছন্দনীয়।

আসল কথা হচ্ছে, তা কখনোই শিরক নয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, জীবিত অবস্থায় যেমন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) অনেক ক্ষেত্রে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও ওয়াসীলা গ্রহণ করেছেন তেমনি আখিরাত ও কিয়ামতের দিন তাঁর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করবেন। এ ইস্তিগাছার ফলস্বরূপ শাফীউল মুযনিবীন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্ তায়ালার কাছে পাপী বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন।

তাই যেহেতু পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ প্রমাণিত হলো সেহেতু উভয় প্রকার হায়াতের মধ্যম পর্যায় কবরের জীবনেও তাকে শিরক বলা কিভাবে বৈধ হবে?

কবর জীবনের প্রমাণ

মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা কবরের জীবনের সত্যতা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আলোকে কিয়ামত দিবসের পুনরুত্থানের মতই সত্য। কুরআনে হাকীমে আল্লার রাব্বুল ইজ্জতের ইরশাদ-

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ —

"কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছো? অথচ তোমরা ছিলে নিস্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা আল বাকারাহ, ২ ঃ ২৮)

এ আয়াতে করীমায় দু'বার মৃত্যু দু'বার জীবন লাভ সর্বশেষ আখিরাতের দিন সমস্ত মানুষ আল্লাহ তায়ালার সামনে পুনুরুত্থানের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

আয়াতে করীমার আলোকে প্রথম মৃত্যু হচ্ছে আমাদের সৃষ্টির পূর্বের অস্তিত্বহীনতা। এরপর জীবন মানে হচ্ছে আমাদের পার্থিব জীবন। এরপর আসবে মৃত্যু। তখন অন্যরা যথারীতি আমাদের কাফন দাফন করবেন। মৃত্যুর পরের এ জীবনকে কবরের জীবন বলা হয়। প্রত্যেক মানুষই কবরে এ জীবন লাভ করে। তখন ফিরিশতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হন। জান্নাত বা জাহান্নামের একটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানালা কবরে খুলে দেয়া হয়। এ দ্বিতীয় জীবনের পর হাশরের দিন আমাদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে উপস্থিত করা হবে। উক্ত কবরের জীবনের স্থায়ীত্ব হচ্ছে কবরের মধ্যে প্রশ্নমালা নিয়ে ফিরিশতাদের আগমনের সময় থেকে হাশরের দিন ইসরাফীলের শিংগায় ফুঁক দেয়া পর্যন্ত।

এটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কবরের জীবনের ব্যাপার (মুসলমান হোক বা কাফির)। এবার দেখুন শহীদদের জীবন সম্পর্কে সূরা বাকারার অন্য একটি আয়াত-

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ —

-"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা তা বুঝ না।" (আল বাকারাহ, ২ ঃ ১৫৪)

এ বিষয়টিকে সূরা আলে ইমরানে কিছু ভিন্ন শব্দের মাধ্যমে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

-"আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত।" (আলে ইমরান, ৩ঃ১৬৯)

শহীদদের জীবনকে প্রত্যেক মতের অনুসারীরাই সমর্থন করেন। এমনকি উল্লেখিত আয়াতে করীমা ছাড়াও অসংখ্য হাদীসে কাফির ও মুশরিকদের মৃত্যুর পর জীবন এবং মৃত্যুর পর জীবিত লোকদের কথা শোনার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বদর যুদ্ধের পর সওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নিহত কাফির ও মুশরিকদের নাম ধরে আহবান করেছেন এবং তাদের কাছে প্রশ্ন করেছেন-

فَاِنَّا وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟

-" নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দেয়া প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখতে পেয়েছি। (হে কাফির ও মুশকিরা) তোমরা ও কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদার সত্যতা পেয়েছো?"

এ সময় সাইয়িদুনা উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এ আরজ পেশ করলেন, হুযূর আপনি কতগুলো নিষ্প্রাণ দেহের সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে বললেন-

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهٖ ! مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ —

-" সে মহান সত্ত্বার কসম-যার কুদরতী কবজায় আমার প্রাণ! আমি কাফির ও মুশরিকদের সাথে যে সব কথা বলছি তা তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছে।" (সহীহুল বুখারী কিতাবুল মাগাযী ২ঃ ৫৬৬)

সহীহ বুখারীর এ পবিত্র হাদীসে কাফির ও মুশরিকদের মৃত্যু পরবর্তী কবরের জীবনের শ্রবণশক্তি শুধুমাত্র সাধারণ জীবিত মানুষ নয় বরং জীবিত সাহাবীদের (রাঃ) শ্রবণ শক্তির চেয়েও বেশী বলা হচ্ছে।

একইভাবে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকারী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে গমনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন কবরবাসীদেরকে 'ইয়া' (হে) বলে সম্বোধন করে সালাম দেয়। এজন্যই মুসলমানরা তাদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, কবর স্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যেন অবশ্যই "আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর" বলে।

যেহেতু কাফির ও মুশরিকদের জীবন, সাধারণ মু'মিনদের জীবন এবং শহীদ ও সালিহীনের জীবন আপন আপন অবস্থার আলোকে কুরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত তখন নবীগণ (আলাইহিমূস্ সালাম) বিশেষতঃ তাজেদারে আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুপম হায়াতকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? অথচ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় পবিত্র জবানে বহুবার এ ঘোষণা দিয়েছেন---

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُّرْزَقُ—

-"আল্লাহ্ তায়ালা মাটির জন্য নবীদের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) জীবিত। তাদের কাছে রিযক পাঠানো হয়।"

(সুনান্ আন নাসাঈ, জুমুআ অধ্যায়, ১ ঃ ২০৪)
(সুনান্ আবূ দাউদ, সালাত অধ্যায়, ১ ঃ ১৫৭)
(সুনান ইবনে মাজাহ, জানাযা অধ্যায়, ১১৯)

এ পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) তাদের কবর সমূহে জীবিত থাকেন। একটি বরকতময় হাদীসে তো এটাও বর্ণিত আছে যে, সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে উম্মতের সমস্ত আমল পেশ করা হয়। নেক আমলগুলোর জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্ তায়ালার

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুকরিয়া আদায় করেন। মন্দ আমলের জন্য হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর দরবারে উম্মতের মাগফিরাত কামনা করে দুআ করেন। হাদীসের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

تُعْرِضُ على اعما لكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم —

-"তোমাদের আমলগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। যখন তা ভাল হয় তখন আমি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করি। আর যখন আমলগুলো মন্দ হয় তখন আল্লাহ তায়ালার কাছে তোমাদের জন্য মাগফিরাত চেয়ে দু'আ করি।" (মাজমাউয্ যাওয়াইদ , ৯ ঃ ২৪)

সে আল্লাহ (যুল জালাল) যিনি এ পৃথিবীতে এবং আখিরাতে সমস্ত মানুষকে জীবন এবং রিয্ক দানের শক্তি রাখেন তিনিই আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস্সালাম) কে কবরের মধ্যেও জীবিত রাখতে ও রিয্ক দানে ক্ষমতাবান।

ইসলামী সাহিত্যে ঢুকে পড়া গ্রীক দর্শনে রূহের কবরের জীবন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক আলোচনাগুলো ইসলামের চিরন্তন, অবিকৃত ও বাস্তবভিত্তিক মজবুত মূলনীতির সামনে গুরুত্বহীন।

ইসলামী বিধি-বিধান পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে হায়াতের প্রকারভেদ এবং কবরের হায়াত প্রাপ্ত মানুষকে আহবান করা সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের শিক্ষাকে উপস্থাপন করছে। সুস্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে একথার ঘোষণা দিচ্ছে যে, নবীগণ (আলাইহিমুস্সালাম) শহীদগণ, সালিহগণ সাধারণ মানুষ এমনকি কাফির মুশরিকরাও তাদের আপন আপন কবরে জীবিত। শহীদদের কাছে কবরের রীতি অনুযায়ী রিযক পৌছানোর ব্যাপারে কুরআন মাজীদ নিজেই সাক্ষী।

তাই যারা জাগতিক জীবনে ইস্তিগাছাকে বৈধ মনে করে মৃত্যু পরবর্তী ইস্তিগাছাকে হারাম বরং শির্ক বলে গণ্য করছে তাদের উদ্দেশে একথাই বলা যায়, মৃত্যু হচ্ছে এক মুহূর্তের আস্বাদন যা নিমিষেই চলে যায়। হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী'র (রাহঃ) ভাষায়-

موت تجديد مذاق زندگی کا نام ہے

نواب کے ہردم مین بیداری کاك بغام ہے

-" মৃত্যু হচ্ছে জীবনের স্বাদ নবায়নের নাম, স্বপ্নের আবরণে জাগরণের পয়গাম।"

পার্থিব জীবন এবং কিয়ামতের দিবসে প্রাপ্ত পরকালীন জীবনের মধ্যকার জীবন হচ্ছে কবরের জীবন। তাই পার্থিব ও পরকালীন জীবন প্রাপ্ত মানুষের কাছে যেমন ইস্তিমদাদ, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাছা করা বৈধ অনুরূপভাবে কবরের জীবন প্রাপ্তদের কাছেও ইস্তিগাছা বৈধ। এর মধ্যে শির্কের বিন্দুমাত্র সন্দেহও অনুপস্থিত। কেননা, দুনিয়া, কবর ও আখিরাত তিন জীবনেই আল্লাহ্ তায়ালাকে প্রকৃত মুস্তাআন এবং বান্দাকে রূপক মুস্তাগাছ মেনে ইস্তিগাছা করা যায়। আর তা বৈধ।

উল্লেখিত তিন জীবনের কোনটিতেই বান্দাকে প্রকৃত মুস্তাগাছ মনে করা অকাট্যভাবে শিরক। জীবনের ভিন্নতার কারণে নয় বরং হাকীকত ও মাজাযের পার্থক্যের ভিত্তিতেই শিরকের হুকুম সাব্যস্ত হয়।

"রূহ"-এর হায়াত ও ক্ষমতা

অকাট্য দলীলের মাধ্যমে মানুষের "রূহ"-এর কবরের জীবন প্রমাণিত হওয়ার পর মৃত্যুর পরবর্তী ইস্তিগাছাকে নাজায়েয মনে করা অজ্ঞতা বা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। নবী ও সালিহগণের রূহের কাছে সাহায্য চাওয়া কোন জীবিত মানুষ বা ফিরিশতার কাছে সাহায্য চাওয়ার মতই সঠিক। যখন আমরা জীবিত কোন মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থী হই তখন বাস্তবে তার রূহের কাছেই সাহায্য চেয়ে থাকি। মানুষের শরীরটা হচ্ছে মানুষের রূহের পোষাক মাত্র। মৃত্যুর পর যখন রূহটা মানবদেহের পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে যায় তখন তা মাটির তৈরী শরীরের সীমাবদ্ধতা থেকেও মুক্ত হয়। ফলে তা ফিরিশতাদের মতই কিংবা আরো বেশী অলৌকিক ও অস্বাভাবিক কাজ করতে সক্ষম হয়। আমাদের বস্তু জগতে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য যে সব নিয়ম কানুনের প্রয়োজন হয় "রূহ" সে সবের বহু উর্ধে। কেননা রূহের জগত হলো "আলমে আমর"। তা শরীরের এ কার্যকারণের জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

-"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশ ঘটিত।" (আল ইসরা, ১৭ঃ৮৫)

কবরের মধ্যে রূহগুলো আলমে আমরের যে জীবন লাভ করে তাতে সে পৃথিবীর শারীরিক জীবন থেকে বহুগুণ বেশী কাজ করার শক্তি পায়। তাদেরকে আহবানকারী এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করতে পারে।

যদি সাহায্য প্রার্থনাকে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান ক্ষেত্রে বৈধ মনে করা হয় তাহলে তা ঈমানের চাহিদা নয় বরং মনগড়া দর্শনের কাছে আত্মসমর্পন। কারণ প্রাচীন

pdf By Syed Mostafa Sakib

দর্শনশাস্ত্র ঈমানের সুক্ষ্ম রহস্যাবলীর সমর্থক নয়। ঈমানের রহস্যাবলী জানার জন্য অন্তরের স্বচ্ছতা ও নিখুঁত প্রেমের প্রয়োজন।

প্রকাশ থাকে যে, নবী ও সালিহগন সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা সাহায্যের ভিখারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে দু'আ করেন। আর আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাদের দু'আকে কবুল করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করেন। এটা হচ্ছে কোন বয়স্ক লোক ছোট ছেলের জন্য কিংবা ভাই অপর ভাইয়ের জন্য দু'আ করার মতই সহজবোধ্য ও সঠিক। সমস্যা হচ্ছে বিরুদ্ধবাদীরা কবরবাসীদের জীবনকে অস্বীকার পূর্বক তাদেরকে দু'আ করার যোগ্যও মনে করে না। অথচ বিশুদ্ধ ইসলামী আকিদা হচ্ছে যে, তারা জীবিত। নিজ অনুভূতি ও বিবেকের মাধ্যমে জিয়ারতকারীদের চিনতে পারেন। শরীর থেকে মুক্ত হওয়ার পর "রূহ"-এর অনুভূতি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মানবীয় প্রবৃত্তি দূর হওয়ার কারণে মৃত্তিকার আবরণ সরে যায়।

সাহায্য প্রার্থনাকে এভাবেও বোঝা যায় যে, যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। কিন্তু সাহায্য প্রার্থী এমন ভাবে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওয়াসীলায় সে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রয়োজন পূরণের আশাবাদী। সে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের ওয়াসীলা নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আরয করে, আমি এ অলি ও সালিহগণের প্রেমিকদের একজন। তাই তাদের ভালবাসা ও নৈকট্যের কারণে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের হকদার। ফলে আল্লাহ্ তায়ালা তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা দু'আর মধ্যে উল্লেখিত আউলিয়ায়ে কিরামের ওয়াসীলায় সে ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি গুলো ক্ষমা করে দেন। তার প্রয়োজন পূরণ করেন।

মৃত ব্যক্তির জন্য জানাযার নামায আদায় কারীদের মাগফিরাত কামনাও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা জানাযায় উপস্থিত লোকেরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র দরবারে মৃত ব্যক্তির ক্ষমা লাভের ওয়াসীলা বানায় এবং তার সাহায্যকারী হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভ্রান্তির অপনোদন

নবী, অলি ও সালিহগণের কাছে সাহায্য চাওয়া মত্য ও সঠিক এবং কুরআন সুন্নাহ্র মাধ্যমে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীরা কিছু মনগড়া অভিযোগের ভিত্তিতে ইস্তিগাছার উপর শিরকের কালিমা লেপনে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা এ অধ্যায়ে ইস্তিগাছার উপর আরোপিত কিছু উল্লেখযোগ্য আপত্তির প্রেক্ষিতে কুরআন ও হাদীসের দলীলের মাধ্যমে ইস্তিগাছার বৈধতা সম্বলিত জবাব পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করছি।

প্রথম আপত্তি
সাহায্য প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদত

কারো ওয়াসীলা নিয়ে ইস্তিগাছা করাকে শিরক সাব্যস্ত করার জন্য সর্বপ্রথম তাকে ইবাদাতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এরপর বলা হয়, যেহেতু আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত শিরক তাই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত ব্যতীত কারো কাছে ইস্তিআনা-ইস্তিগাছাও শিরক। এ দাবীর সপক্ষে দলীল হিসেবে কিছু আয়াতও পেশ করা হয়। যেমন আল্লাহ্র ইরশাদ-

1- اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ —

-"না তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন যখন তাকে আহবান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ।" (আন্ নামল ২৭ঃ৬২)

2 - وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ
— اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

- "এবং যারা আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনা বরং ওরা নিজেরাই'সৃজিত।" (আন্ নাহ্ল, ১৬ ঃ ২০,২১)

3- وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ — اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ—

-"এবং তিনি ব্যতীত যেগুলোর তোমরা পুজা করছ সেগুলো খেজুর আঁটির আবরণেরও মালিক নয়। তোমরা যেগুলোকে আহবান করলে সেগুলো তোমাদের আহবান শুনে না এবং যদি শুনেছে বলে ধরেও নেয়া হয় তবে তোমাদের চাহিদা মেটাতে পারে না। এবং কিয়ামত দিবসে সেগুলো তোমাদের শিরককে অস্বীকার করে। এবং তোমাকে কিছুই বলবে না ঐ বর্ণনাকারীর মতো।" (ফাতির, ৩৫ ঃ ১৩, ১৪)

4- وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ —

pdf By Syed Mostafa Sakib

-"এবং তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কে যে আল্লাহ ব্যতীত এমন সবের পূজা করে, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রার্থনা শুনবে না। এবং যেগুলোর নিকট এদের পূজার খবরও নেই।" (আহকাফ ৪৬ ঃ ৫)

5- يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ —

-"আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর পূজা করে, যা তাদের ভাল মন্দ কিছুই করে না।"(আল- হাজ্ব, ২২ ঃ ১২)

6- ولا تدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكَ ولا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ — وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوَ —

-" আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার ভাল করবে না। মন্দও করবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর তাহলে তখন তুমিও জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা খন্ডাবার মত তিনি ছাড়া।" (ইউনুস ১১ ঃ ১০৬, ১০৭)

7 — يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ —

-"সে এমন কিছুকে ডাকে যার অপকার উপকারের আগে পৌছে।" (আল হজ্ব, ২২ঃ ১৩)

উপরোল্লিখিত আয়াতে মুবারাকা সমূহে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহবানকারীর নিন্দা করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে এ দলীল গ্রহণ করা হয় যে, সাহায্য চাওয়া ও আহবান করা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। তাই অন্য কারো কাছে কৃত ইস্তিগাছা আল্লাহর সিফাতের (গুণাবলী) সাথে শিরক বলে গণ্য হবে। কুরআন করীমের এসব আয়াত থেকে শিরকের উদ্ভাবন করা সম্পূর্ণ ভুল। নিম্নে আমরা এ বিষয়কে স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।

প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত নয়

উল্লেখিত আয়াতে মুবারাকা সমূহে دعا দুআ শব্দটি ইবাদতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদে দুআ শব্দটি সর্বত্র ইবাদতের অর্থ দেয়না। অনেক বিপথগামী বিবেক তো (আল্লাহর পানাহ) নবীগণ (আলাইহিমুস্ সালাম) এবং স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার উপরও অপবাদ আরোপের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। দূর থেকে আসা

অর্থের বিনিময়ে নিজেদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখা যায়। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

1- فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ —

-"তাহলে বলুন, এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের।" (আলে ইমরান, ৩ ঃ ৬১)

2- فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا —

-" অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন।" (আল কাসাস, ২৮ ঃ ২৫)

3- ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا —

-" অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে।" (আল বাকারাহ, ২ঃ ২৬০)

4- يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ —

-" স্মরণ করুন, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করবো।" (আল ইসরা, ১৭ ঃ ৭১)

এ আয়াতের তাফসীরে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) যুগের ইমামের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

بِاِمَامِ زَمَانِهِمُ الَّذِىْ دَعَاهُمْ فِى الدُّنْيَا اِلٰى ضَلَالَةٍ اَوْ هُدًى —

-"এর দ্বারা যুগের ঐ ইমাম উদ্দেশ্য যার আহবানে পৃথিবীর মানুষ পরিচালিত হয়। সে আহবান পথ ভ্রষ্টতার দিকে হোক বা সৎ পথের দিকে হোক।" (তাফসীরে মাআলিমুত্ তানযীল, ৩ ঃ ১২৬)

এর অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক জাতি তাদের নেতার পাশে জড়ো হবে, যার নেতৃত্বে তারা পৃথিবীতে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা তার নাম ধরেই এভাবে ডাক দিবেন-"হে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অমুকের অনুসারীরা, তোমাদের পরিণতি ও প্রতিদান এর সাথেই হবে।" মোট কথা উক্ত সুস্পষ্ট আয়াতগুলোতে দু'আ শব্দের অর্থ ইবাদত নেয়া হলে শির্কের পথই খুলে যাবে। বুঝা গেল, যদি দুআকে কাফির ও মুশরিকদের দিকে সম্পর্কিত করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে ইবাদত। কারণ আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি ও পূর্বাপর যোগসূত্রের দ্বারা অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

সাহায্য প্রার্থনার অবৈধতা প্রমাণের জন্য যে সব আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেগুলোতে দুআর সম্পর্ক কাফির ও মুশরিকদের সাথে। তা দ্বারা ইবাদতের অর্থ গ্রহণ করাই সঠিক। কিন্তু তা তো কোন মতেই ইস্তিগাছা অবৈধ হওয়ার দলীল নয়। কারণ আল্লাহর যেসব গ্রহণযোগ্য বান্দার কাছে ইস্তিগাছা করা হয় তাদেরকে কখনোই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য মনে করা হয় না।

দ্বিতীয় আপত্তি
অলৌকিক বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক

এ আপত্তি একটি বিভাজনের কারণে সৃষ্ট। সাহায্য প্রার্থনার আলোচনার সময় কার্যকারণের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিষয় সাধারণভাবে দু'প্রকার।

(১) امور عادية (স্বাভাবিক বিষয়)

(২) امور غير عادية (অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বিষয়)

এ দু' প্রকারের ভিত্তিতে কার্যকারণের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক বিষয়ে ইস্তিগাছা করাকে বৈধ মনে করা হয়। অপরদিকে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বিষয়ে-যা কার্যকারণের উর্ধ্বে-ইস্তিগাছাকে শিরক হিসেবে গণ্য করা হয়।

যে সব কাজ কোন প্রকাশ্য কার্যকারণ তথা মাধ্যমের সাহায্যে করা হয় ঐ কাজগুলোতে যখন কার্যকারণকে বাদ দিয়ে ইস্তিগাছা করা হয় তখন সেটাই হচ্ছে "কার্যকারণ ছাড়া ইস্তিগাছা।"আর স্বাভাবিক প্রচলিত মাধ্যমের সাহায্যে ইস্তিগাছা করাই হচ্ছে 'কার্যকারণের অধীন ইস্তিগাছা।" অর্থাৎ এসব বিষয়ে কারো সহায়তা গ্রহণ করার সময় ঐসব মাধ্যমকে ব্যবহার করা যা উক্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ বিভাজনের বর্ণনার পর এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, বিরুদ্ধবাদীদের মতে দুনিয়াবী প্রয়োজনে পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছে স্বাভাবিক বিষয়ে ইস্তিগাছা, (অর্থাৎ রোগী আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তারের বা ঔষধের সাহায্য গ্রহণ করা) আর তা বৈধ। যেমন আল্লাহর ইরশাদ-

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى

-"তোমরা সৎকাজ ও খোদা ভীরুতার ব্যাপারে পরস্পর সহযোগীতা করো।" (আল মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)।

উক্ত স্বাভাবিক বিষয়ে ইস্তিগাছাকে তাঁরা বৈধ মনে করলেও অলৌকিক ও কার্যকারণের উর্ধ্বের বিষয়ে ইস্তিগাছা (যেমন আরোগ্য লাভের জন্য কোন পীর-মুর্শিদ-অলির কাছে যাওয়া) তাদের মতে হারাম।

আপত্তির বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ

প্রথম নুকতা ঃ

উক্ত দু'ধরনের সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে শেষোক্তটিকে অর্থাৎ কোন মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়া বা অলৌকিক বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনাকে শিরক হিসেবে গণ্য করা হয়। অথচ কুরআন ও সুন্নাহয় ইস্তিগাছাকে এভাবে ভাগ করা হয়নি। তদুপরি ভাগ করার পর একটিকে বৈধ ও অপরটিকে হারাম বলার কোন প্রমাণও কুরআন-সুন্নাহ্য় পাওয়া যায় না। এটা তাদের মনগড়া বিভাজন ও কল্পিত উদ্ভাবন।

এক্ষেত্রে আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বাহ্যিকভাবে কোন মাধ্যম ছাড়া বা অলৌকিক ভাবে সংঘটিত বিষয়েও কোন না কোন কার্যকারণ নেপথ্যে থাকে। كن فيكون (আল্লাহ যখন কোন কিছুকে নির্দেশ করেন হও তখন তা হয়ে যায়) ছাড়া কোন কিছুই কার্যকারণের উর্ধে নয়। যেহেতু কোন কোন বিষয়ের কার্যকারণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না তাই ঐ বিষয়গুলোকে আমরা অলৌকিক ব্যাপার হিসেবে আখ্যায়িত করি।

দ্বিতীয় নুকতা ঃ

সূরা ফাতিহায় যে আয়াতে কারীমাকে এ মাসআলার মূল ভিত্তি মনে করা হয় সেখানেও স্বাভাবিক বিষয়ের কোন শর্ত নেই। إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলে সাহায্য প্রার্থনাকে মুতলাক তথা সাধারণ হুকমের মধ্যে রাখা হয়েছে। মূলনীতি হচ্ছে المطلق يجرى على إطلاقه -"মুতলাক সর্বদা তার আপন সাধারণ হুকুম হিসেবেই বহাল থাকে।"

তাই আমরা কোন মনগড়া বিভাজনের ভিত্তিতে এ অর্থ নির্ধারণ করতে পারি না যে,"হে আল্লাহ্ তায়ালা, আমরা তোমার কাছে সাহায্য চাই শুধুমাত্র অলৌকিক বিষয়ে। কেননা তা তুমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। কিন্তু স্বাভাবিক ব্যাপারগুলোতে যেহেতু তুমি ছাড়াও সাহায্য চাওয়ার আরো অনেক মাধ্যম আছে তাই এসব ব্যাপারে তোমার কাছে সাহায্য চাওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই।"এভাবে ভাগ করা স্বল্প জ্ঞান ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃত পক্ষে এ ধরনের কল্পনাই মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় নুকতা ঃ

বিভিন্ন মাসআলা বুঝানো, জটিলতা দূরীকরণ ও কয়েকটি বিষয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্দেশের সুবিধার্থে কোন বিষয়কে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-এর মধ্যে উক্ত বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও ভাগ করা আবার শুধুমাত্র স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ করার যৌক্তিকতা কি? অপরদিকে তা অলৌকিক বিষয়ে শিরক ফাতওয়া দেওয়াকেও সঠিক মনে করা হচ্ছে। যদি اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যকার ইস্তিআনাকে হাক্বীক্বি (প্রকৃত) ও মাজাযী (রূপক) হিসেবে বিভক্ত করা হয় তা মেনে নিতে বাধা কোথায়? বাস্তবতা হচ্ছে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে হুকমের ভিন্নতা (অর্থাৎ বৈধ হওয়া ও না হওয়া) অবশ্যই যৌক্তিক কিন্তু মাধ্যম বা কার্যকারণের ভিত্তিতে নয় হাক্বীক্বত ও মাজাযের দৃষ্টিতে।

সঠিক ইসলামী আক্বীদা ঃ

اياك نستعين এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আরজ করে যে, "হে আল্লাহ!, আমরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাহ্যিকভাবে যার কাছেই সাহায্য প্রার্থী হইনা কেন তাকে প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করি না বরং প্রকৃত সাহায্যকারী বলে বিশ্বাস করি কেবল তোমাকেই। কেননা তোমার সন্তুষ্টি ব্যতীত কেউই আমার সাহায্যকারী ও অবস্থার পরিবর্তনকারী হতে পারেন না।"

আমাদের আকীদা হচ্ছে আমরা আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হই বা কোন বুযুর্গের দুআর প্রার্থী হই কাউকেই প্রকৃত সাহায্যকারী মনে করি না। কারণ প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত। আমরা ঔষধ ও দু'আ দুটোকেই আরোগ্য লাভের মাধ্যম ছাড়া বেশী কিছু মনে করি না। কারণ প্রকৃত মুস্তাগাছ এবং কার্য সম্পাদনকারী তুমিই।

চতুর্থ নুকতা ঃ

এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে, সাহায্য প্রার্থনাকে যে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ 'কার্যকারণের অধীন হওয়া বা না হওয়া" এবং "হাক্বীক্বত বা মাজায হওয়া" এ দু য়ের মধ্যে কিভাবে সামঞ্জস্যতা বিধান করা যায়?

নিঃসন্দেহে জীবনের অনেক বিষয়ই স্বাভাবিক ও অলৌকিক এ দু' প্রকারের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। এটা নিতান্ত বাস্তব ও বোধগম্য বিষয়। এর জন্য কোন যুক্তি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়গুলোকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর কিছু বিষয়কে অলৌকিক হিসেবে মেনে নিতে হয়। মূলতঃ উভয়

ক্ষেত্রেই কার্যকারণ পাওয়া যায়। তবে পার্থক্য হচ্ছে শুধুমাত্র এটাই যে, স্বাভাবিক বিষয়গুলো সংঘটিত হওয়ার মাধ্যম সহজেই বোধগম্য। অন্যদিকে অলৌকিক বিষয়ের কার্যকারণগুলো মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকে। স্বাভাবিক বিষয়ের মাধ্যমগুলো হচ্ছে জাহেরী (প্রকাশ্য) আর অলৌকিক বিষয়ের মাধ্যম গুলোকে রূহানী (আধ্যাত্মিক) বা বাতিনী (পরোক্ষ) বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। অলৌকিক বিষয়ে যদিও প্রচলিত স্বাভাবিক কার্যকারণের প্রয়োজন নেই কিন্তু অস্বাভাবিক কার্যকারণ সমূহ এখানেও যথারীতি বিদ্যমান। যখন নবী,অলি, সালিহ অথবা কোন মানুষের কাছে কোন স্বাভাবিক বিষয়ে ইস্তিগাছা করা হয় তখন সাহায্য চাওয়ার সময় ব্যবহৃত শব্দ গুলো প্রকৃত অর্থে ব্যহৃত হবে। কিন্তু তখনও প্রকৃত মুস্তাগাছ আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তায়ালা। অর্থাৎ যে বিষয়েই সাহায্য চাওয়া হোক কোনটাতেই হাক্বীক্বতের অর্থ পাওয়া যায় না। পার্থক্য কেবল এটাই- স্বাভাবিক বিষয়ে শব্দের ব্যবহার হাক্বীক্বীতের ভিত্তিতে কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে হাক্বীক্বি অর্থ নেয়াটা অসম্ভব হয়ে যায়। তাই শব্দকে ও হাক্বীক্বতের উপর প্রয়োগ করা হয়নি।

মোদ্দা কথা হলো, অর্থগত দিক থেকে হোক বা আকীদাগত ভাবে হোক উভয় দৃষ্টিকোণেই হাক্বীক্বি ইস্তিগাছা আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য নির্দিষ্ট।

(তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে জানার জন্য লেখকের "আক্বীদায়ে তাওহীদ আওর হাক্বীক্বতে শিরক" গ্রন্থটি দেখুন।)

হাকীকত ও মাজাযের বিভাজন অপরিহার্য

সাহায্য প্রার্থনা বিরোধীদের একটি দলের মত হচ্ছে, স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। তদুপরি এখানে হাকীকত ও মাজাযের কোন গুরুত্ব নেই।

এখন উক্ত মতের সমর্থকদের কাছে প্রশ্ন যদি স্বাভাবিক বিষয়সমূহে সাহায্য প্রার্থনাকে বৈধ ও সঠিক মনে করা হয় এবং হাক্বীক্বি ও মাজাযী সাহায্য প্রার্থনা বলতে কিছু না থাকে তাহলে এসব বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী কে হবেন?

যখন কোন রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসায়র জন্য যায় তখন প্রকৃত সাহায্যকারী কে হবেন? প্রকৃত সাহায্যকারী কি ঐ ডাক্তার যিনি রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন না আল্লাহ্ তায়ালা?

যদি এর জবাব এটা হয় যে দুনিয়াবী বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ্ তায়ালা তাহলে স্বাভাবিক ও অলৌকিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য কি থাকলো?া একই সাহায্য প্রার্থনা অলৌকিক ব্যাপারে শিরক আর স্বাভাবিক বিষয়ে বৈধ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ মূলনীতি কোথা থেকে এলো যে, হাকীকত ও মাজাযকে না মেনে সাধারণভাবে আল্লাহ কেই সাহায্যকারী মনে করে আবার অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ানো যাবে? অথচ কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে-

وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

-"আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (আল আম্বিয়া, ২১ঃ১১২)

যদি এর জবাব এভাবে দেয়া হয় যে, স্বাভাবিক বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা নন মানুষই তাহলে প্রকৃত সাহায্যকারী একাধিক হয়ে যায় যা নিঃসন্দেহে শিরক। অর্থাৎ দুনিয়াবী কাজ কর্মে সাহায্যকারী হবে বান্দা আর অলৌকিক বিষয়ে সাহায্যকারী আল্লাহ্ তায়ালা?

এ দুয়ের ভিত্তিতে যখন বান্দাকে সাহায্যকারী মানা হলো তখন এটা ঐ পর্যায়ের শিরকের মধ্যে গণ্য হবে যা মক্কার কাফির ও মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তারা দুনিয়াবী বিষয়ে বান্দাকে সাহায্যকারী মনে করতো এবং অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্যকারী মানতো। যদি একথা বলা হয় যে, দুনিয়াবী বিষয়েও আল্লাহ্ তায়ালাই মুস্তাআন তাহলে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া কিভাবে বৈধ হলো?

বিচার্য বিষয় হচ্ছে, বিরুদ্ধবাদীদের মতে স্বাভাবিক বিষয়ে প্রকৃত সাহায্যকারী আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর সৃষ্টির কাছে সাহায্য প্রার্থনা কেবল মাত্র বাহ্যিক ও মাজাযী অর্থে করা হয়। হাক্বীক্বি অর্থে নয়। এখন প্রশ্ন জাগে যদি স্বাভাবিক কার্যকারণের অধীন বিষয়ে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া মাজাযী ইস্তিগাছা হওয়ার কারণে জায়েয হয় তাহলে অলৌকিক বিষয়ে মাজায হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে হারাম হয়ে গেল? অথচ সেখানেও ইস্তিগাছা হাক্বীক্বি নয় মাজাযীই ছিল।

অলৌকিক বিষয়ে মাজাযের বৈধতা

অলৌকিক বিষয়ে মাজাযের ব্যবহার এ দৃষ্টিকোণ থেকেও বৈধ যে, তা বাহ্যিকভাবে যদিও ইস্তিগাছা কিন্তু এর দ্বারা তাওয়াস্সুলের অর্থও নেওয়া যায়। প্রকৃত মুস্তাআন মনে করা হয় আল্লাহ্ তায়ালাকেই। মাজাযী অর্থে ইস্তিগাছার ব্যবহার কুরআন মাজীদে বিভিন্নভাবে এসেছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ মাজাযের ব্যবহার হয়েছে অলৌকিক বিষয়ের জন্য। কুরআন মাজীদে মাজাযের যে বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তা থেকে কয়েকটা স্থানের উল্লেখ আমরা এখানে করবো। যাতে পাঠকের বিবেক ও অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে হাক্বীক্বত ও মাজাযের অস্বীকারের ফলাফল কত ভয়াবহ হতে পারে।

জিবরাঈলের (আঃ) উপর শির্কের ফাতওয়া?

হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-এর জন্ম সংক্রান্ত ঘটনায় হযরত মারয়াম (আঃ)-এর কাছে মানবীয় আকৃতিতে এসে বললেন-

اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا –

"(সে বললো) আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাবো।" (মারয়াম,১৯ঃ১৯)

উপরোল্লিখিত আয়াতে জিবরাঈল আমীন (আঃ)এর উক্তি অলৌকিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়া সন্তান জন্ম লাভ করা এবং এমতাবস্থায় এটা বলা, "আমি তোমাকে একজন পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবো" অলৌকিক বিষয়ে সাহায্য করার বড় কুরআনী দৃষ্টান্ত। সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি ছাড়া এ পৃথিবীতে এর কল্পনাও অসম্ভব।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র তাওয়াস্সুলের নিয়তে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কোন সম্মানিত বান্দার ওয়াসীলা নিয়ে সন্তান কামনা করে তখন কিছু মুর্খ বন্ধু তৎক্ষণাত শিরকের ফাতওয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। আর যখন জিবরাঈল (আঃ) (যিনি খোদা নন) বলেন, আমি পুত্র সন্তান দেবো, আর আল্লাহ্ তায়ালাও স্বয়ং তা কুরআন মাজীদে স্থান দেন তখন এটাও অনুরূপ শিরক হবে না? উভয় ক্ষেত্রেই আবেদন কারী মানুষ কিন্তু দাতা যদি বলেন যে, 'আমি তোমাকে পুত্র সন্তান দেবো' তখন এ বাক্যকে যদি মাজাযী অর্থে গ্রহণ করা না হয় তাহলে বাস্তবিকপক্ষে তিনি খোদা হওয়ার সমার্থক।সন্তান দান করা আল্লাহর কাজ। বান্দার কাজ হচ্ছে তার দিকে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাওয়া যদি শিরক হয় তাহলে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ যদি বলে যে, আমি সন্তান দেবো তাহলে তা আরো বেশী শিরক হিসেবে গণ্য হওয়াই উচিত। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জিবরাঈল আমীন (আঃ) لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا বলার পরও মুশরিক হলেন না বরং তার উক্তি সত্যই থাকলো তাহলে এ উক্তির কি ব্যাখ্যা হবে?

জবাব ঃ

এ উক্তি যদিও রূহুল আমীন (আঃ)-এর অর্থাৎ "আমি পুত্র সন্তান দান করব' কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে ঐ সন্তান যা আল্লাহ তায়ালা দান করবেন আমি তাঁর কার্যকারণ তথা মাধ্যম ও ওয়াসীলা হলাম। সুতরাং উক্ত আয়াতে কারীমায় لاهب لك غلاماً زكيًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

এর মধ্যে সাহায্য করার আমল পাওয়া গেলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য তাওয়াস্‌সুল তথা ওয়াসীলা গ্রহণ। এবং তাঁর পুত্র সন্তান দানের উক্তিটি কুরআন কারীমে মাজাযের (রূপকার্থ) ব্যবহারের উত্তম দৃষ্টান্ত।

সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-এর উপর শিরকের ফাতওয়া?

সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ) যখন তার উম্মতের কাছে সত্যের আওয়াজকে বুলন্দ করলেন, তাদেরকে শিরক থেকে বাঁচার এবং একক অদ্বিতীয় আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহবান করলেন তখন তিনি তার সম্প্রদায়ের সামনে কিছু মুজিযা প্রদর্শন করলেন। কুরআন মাজীদে তার উক্ত দাওয়াতের বর্ণনা এভাবে এসেছে-

اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّيْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهَا فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ —

-"তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শন সমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই-যা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আসো। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।" (সূরা আলে ইমরান, ৩ঃ৪৯)।

উক্ত আয়াতে করীমায় সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-এর হাত থেকে মোট পাঁচটি মুজিযা প্রকাশের উল্লেখ রয়েছে।

(১)- মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ তৈরী করে তাকে জীবন দান।
(২)- জন্মান্ধকে দৃষ্টি দান,
(৩)- শ্বেত কুষ্ঠ রোগীর নিরাময়,
(৪)- মৃতকে জীবন দান,
(৫)- অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান,

এ পাঁচটি মু'জিযা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হযরত ঈসা (আঃ) কে দান করেন। তিনিও ঘোষণার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে তার সত্যায়ন করেছেন। এখানে কেবলমাত্র এটা বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট যে, এ আয়াতে করীমায় হযরত ঈসা (আঃ) বলছেন, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। اَنِّيْ اَخْلُقُ لَكُمْ (আমি তোমাদের জন্য তৈরী করি) এর মধ্যে اَجْعَلُ এর পরিবর্তে اَخْلُقُ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যদি আপনি গভীর ভাবে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আয়াতে মুবারাকার সকল আলোচনা হাক্বীক্বত ও মাজাযের ভিত্তিতে।

প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত

উপর্যুক্ত আয়াতে করীমায়ও সাইয়িদুনা ঈসা(আঃ) প্রকৃত মুস্তাআন নন। বরং আল্লাহ তায়ালাই প্রকৃত সাহায্যকারী। নিঃসন্দেহে উক্ত শব্দগুলো মাজায হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে। সকল আলোচনা শব্দের ভিত্তিতে। তাই এটাই মূলনীতি হিসেবে প্রমাণিত হলো যে, এসব শব্দের ব্যবহার মাজায হিসেবে জায়েয। উক্ত আয়াতে সকল সীগাহ বক্তার পক্ষ থেকে অর্থাৎ উত্তম পুরুষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এ কাজের প্রকৃত সম্পাদনকারী আল্লাহ। অর্থাৎ বাস্তবতা হচ্ছে তা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সংঘটিত হয়। কুরআন করীমে উল্লেখিত শব্দাবলী হাকীকত ও মাজাযের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এটা কি মুজিযা নয়?

এক্ষেত্রে কেউ কেউ এটাও বলতে পারেন যে, এসব ঘটনা সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-এর মু'জিযা। সাহায্য প্রার্থনার আলোচনায় মুজিযাকে কেন টেনে আনা হচ্ছে? কেননা এখানে তো মু'জিযা আলোচ্য বিষয় নয়। এর স্বচ্ছ জবাব হচ্ছে, "মু'জিযা হচ্ছে রোগীর আরোগ্য লাভ করা। তিনি নিজেকে রোগ নিরাময়ের দিকে সম্পর্কিত করা নয়।" (অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কর্তৃক রোগীকে নিরাময় দান করার মাধ্যমে রোগীর প্রতি তাঁর সাহায্য প্রমাণিত হয়। যা ইস্তিগাছার অন্তর্ভুক্ত।)

মূল কথা হচ্ছে, তিনি ঈসা (আঃ) নিজেকে উল্লেখিত অলৌকিক কাজগুলো করার উপযুক্ত মনে করাটা মাজায হিসেবে। আরোগ্য ও রোগাক্রান্ত হওয়া মূলতঃ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে। যখন একথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়কারী আল্লাহ তায়ালাই তাহলে এরপরও হযরত ঈসা (আঃ) এটা কেন বললেন যে, "আমি নিরাময় করি।" উচিত ছিল এটা বলা, আল্লাহ তায়ালা আমার হাত বুলানোর মাধ্যমে জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান এবং শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেন। তখনও তো মুজিযার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতো না। আর মুজিযার উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরকে অক্ষম করে দেয়া। তা না করে তিনি মাজায হিসেবে উক্ত শব্দগুলোকে নিজের দিকেই সম্পর্কিত করলেন।

চতুর্থ উক্তি ঃ তিনি বলেন, وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ "এবং আমি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করি"। এটা বলেই বাক্যের ইতি টানলেন। এ ভাবে বলেননি যে, "তোমরা কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসো। আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করবো। আল্লাহ তায়ালা আমার দু'আর কারণে তাকে জীবিত করবেন।" তিনি বলেন, "আমি মৃতদেরকে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করি।" এর অর্থ হচ্ছে, এসব সীগাহ ও শব্দাবলীর ব্যবহার এবং এগুলোকে কোন মানুষের দিকে সম্পর্কিত করা মাজাযী হিসেবে বৈধ।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ) কর্তৃক উপর্যুক্ত কাজগুলোকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করা মাজাযী হিসেবে সঠিক। উক্ত আয়াতের অন্য অংশে তিনি بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ "আল্লাহর নির্দেশে" বলে প্রকৃত কার্যসম্পাদনকারী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতকেই মেনে নিলেন।

পঞ্চম উক্তি ঃ হযরত ঈসা (আঃ) বলেন,

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ

"আমি সংবাদ দেবো যা তোমরা খাও এবং তোমাদের ঘরে জমা করে রাখো।" এখানে কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, "আল্লাহ্ তায়ালা জানিয়ে দেওয়ার পরই তা করি। বরং বললেন انبئكم "আমি তোমাদেরকে সংবাদ দেবো।" এ শব্দগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ইলমে গায়বের ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে। কারণ ঘরে কে কি আহার করেছে তা জানা ইলমে গায়বের অন্তর্ভূক্ত। যা আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দেওয়া ছাড়া কেউ জানতে পারে না। সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ) বলেননি আল্লাহ তায়ালা আমাকে জানিয়ে দেন। যদিও বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহই জানিয়ে দেন কিন্তু তিনি তা নিজের কথার মধ্যে প্রকাশ করেন নি। মাজাযী হিসেবে এ গায়বের সম্পর্ক নিজের দিকেই করেছেন। বুঝা গেল, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে ইলমে গায়েবকে সম্পর্কিত করা মাজাযী হিসেবে বৈধ। নতুবা আল্লাহর একজন রাসূলের কাছ থেকে এ কাজ কখনোই প্রকাশ পেতো না।

সাইয়িদুনা ঈসা (আঃ)-তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে নুবুওয়াতের দাবী করতে গিয়ে যে সব ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান কালের নামধারী তাওহীদবাদীদের মতে এর কোনটিই শিরকের গন্ডির বাইরে যাবে না। এ ধরণের চিন্তাধারার ফলে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)-

যাঁরা নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে মানব জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন-তাঁদের নুবুওয়াতের নিষ্কলুষ জামাও কালিমা মুক্ত থাকবে না। তাঁরাও শিরকের ফাতওয়া থেকে বাঁচতে পারবেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ তায়ালার উপর শিরকের ফাতওয়া?

সূরা আলে ইমরানের উপরোল্লিখিত আয়াতে করীমায় সাইয়্যিদুনা ঈসা (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হচ্ছে আমি "আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি।" "মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ তৈরী করে এতে প্রাণ সঞ্চার করি।" কিন্তু নিম্নোক্ত আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাও তার এ কাজগুলো সত্যায়িত করেছেন, আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ-

وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ

-"যখন তুমি কাদা মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে।" (আল মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১০)

আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেন নাই যে, হে ঈসা (আঃ) "আমি তোমার জন্য মাটির পাখি বানাই এবং তাকে জীবন দান করি।" "তোমার জন্য জমান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করি। "শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি।" আল্লাহ খাঁটি তাওহীদবাদীদের (?) ইচ্ছানুযায়ী হাকীকতের ভিত্তিতে কথাগুলো এভাবেও বলতে পারতেন। কিন্তু সে মহান স্রষ্টা ও মালিক বলেন,

فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ —

-"অতঃপর তুমি তাতে ফুঁক দিতে, ফলে তা আমার আদেশে পাখি হয়ে যেতো।" (আল মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১০)

রূহ ফুঁকে দেওয়া মূলতঃ আল্লাহ তায়ালার কাজ

এটা সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা যে, কারো মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া এবং জীবন দান করা সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টার কাজ। কিন্তু তিনি স্বয়ং ঈসা (আ.) কে বললেন, فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ — "অতঃপর তুমি তাতে ফুঁক দিতে তখন তা আমার হুকুমে উড়তে শুরু করতো।" وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ "যখন তুমি জন্মান্ধ ও শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করতে।" واذ تخرج الموتى باذنى "যখন তুমি আমার হুকুমে মৃতদেরকে (জীবিত করে কবর থেকে) বের করে (দাঁড় করিয়ে) দিতে।"

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, এশব্দগুলোকে আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা মাজায হিসেবে বৈধ। শব্দগুলো স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ব্যবহার করেছেন। নবীগণ (আঃ)ও ব্যবহার করেছেন। অথচ এ কথাগুলো বলার জন্য তাদেরকে কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত এ শব্দগুলোকে মাজাযী (রূপক) অর্থে ব্যবহার করা কেবল মাজাযী অর্থের বৈধতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ নয় বরং তা আল্লাহর সুন্নাত হওয়ার দিকেও নির্দেশ করে।

এ সকল আলোচনা থেকে জাহিরী (প্রকাশ্য) ও বাতিনী (অপ্রকাশ্য) কার্যকারণের জন্য একটি নির্দিষ্ট মূলনীতিও পাওয়া গেল। তা হচ্ছে সকল অলৌকিক বিষয়ে শব্দগুলো যদিও বান্দা ও সৃষ্টির দিকে সম্পর্কিত করা হয় তবুও প্রকৃত কর্তা আল্লাহ তায়ালাকেই মানতে হবে। কারণ প্রকৃত কার্যসম্পাদনকারী তিনিই।

তৃতীয় আপত্তি

অন্যের ওয়াসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে অদৃশ্য ক্ষমতার সন্দেহ বিদ্যমান

অন্যের ওয়াসীলা নিয়ে সাহায্য প্রার্থনাকে শিরক প্রমাণ করা জন্য বলা হয় দূর থেকে সাহায্য চাওয়া অলৌকিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যার কাছে সাহায্য চাওয়া হয় এ আমল দ্বারা তার অদৃশ্য শক্তি ও ক্ষমতা মেনে নিতে হয়। যখন আপনি তাকে দূর থেকে আহবান করলেন তখন আপনার এ আকীদা ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেল যে, তার কাছে অদৃশ্য মহান ক্ষমতা এবং পূর্ণ তাসাররুফ রয়েছে। আর এ ধরনের বিশ্বাস শিরক।

মনগড়া আক্বীদাগত ফিতনার খন্ডন

মনগড়া যুক্তির প্রতারণাই এ মাসআলাকে বিভ্রান্তির মধ্যে আটকে রেখেছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এখানে যাকে অদৃশ্য ক্ষমতা বলে নামকরণ করা হচ্ছে তা মূলত রূহানী (আধ্যাত্মিক) ক্ষমতা। যা আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রদত্ত এ রূহানী শক্তি ও ক্ষমতাকে অদৃশ্য ক্ষমতা নাম দিয়ে অনেক বড় আক্বীদাগত ফিতনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। অদৃশ্য ক্ষমতার মূল অর্থ তা কখনোই নয় যা সাধারণভাবে ইস্তিগাছার বিরোধীতার খাতিরে বর্ণনা করা হয়। কেননা, আমরা দেখি এ ধরনের ক্ষমতা তো সব মানুষ এমনকি অনুসলিমদের কাছেও আছে। অদৃশ্য ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপ এ যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সর্বশেষ সংযোজন ইন্টারনেটকে উল্লেখ করতে পারি। বস্তুগত উন্নতির এ

বিজ্ঞানময় পৃথিবীতে Global Village (বিশ্বায়ন) এর আধুনিক চিন্তাধারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কম্পিউটারের জগতে সকল ব্যবধান ও দূরত্ব কমে আসছে। নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রায় এক কোটি কম্পিউটার বিস্তৃত ইন্টারনেট পুরো পৃথিবীকে একটি সরিষার দানার মত সংকুচিত করে ফেলেছে। চলমান যুগের বিজ্ঞানের উন্নতি এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, যে কোন সাধারণ মানুষ বদ্ধ কক্ষে বসে নিজের হাতের তালুতে রাখা সরিষার দানার মত সমগ্র বিশ্বকে দেখতে পারে। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ইন্টারনেট ও তার সাথে সংযুক্ত অসংখ্য কম্পিউটার নামক অনুভূতিহীন যন্ত্রগুলো কি অদৃশ্য ক্ষমতার মালিক? মানুষের মেধা দিয়ে উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলকে অদৃশ্য ক্ষমতা ও শিরক বলা হয় না। অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত রূহানী শক্তিকে অস্বীকার করার মানসে ভিত্তিহীন ও কল্পিত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাকে অদৃশ্য ক্ষমতা নাম দিয়ে শিরক প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল হিসেব অসম্ভব বস্তু সম্ভব হওয়া এবং ইন্টারনেটের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সংঘটিত ঘটনাবলী মুহূর্তেই বিশ্বময় পৌছে পাওয়া যদি তাওহীদের বিরোধী না হয় তাহলে রূহানী কার্যকারণের শক্তির প্রকাশও কখনোই শিরকের অবকাশ রাখে না।

কাফির ও মুশরিকদের আবিস্কৃত প্রযুক্তির কল্যাণে প্রাপ্ত ক্ষমতা যদি শিরকের কারণ না হয় তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত রূহানী ক্ষমতা ও প্রভাবকে সম্মানিত নবী, অলী ও সালিহগণের দিকে সম্পর্কিত করলে শিরক বলা যায় কোন যুক্তিতে?

আধুনিক যুগের বস্তুগত উৎকর্ষের ক্ষমতা আপন জায়গায় থাকুক। কিন্তু তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলামদের ক্ষমতা, তাদের রূহানী উন্নতি ও পরিপূর্ণতা তো এর বহু উর্ধে। সে রূহানী শক্তির জোরেই সরকার গাউছে আযম সাইয়িদুনা আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ) বলেন,

نَظَرْتُ اِلٰى بِلَادِ اللهِ جَمْعًا — كَخَرْدَلَةٍ عَلٰى حُكْمِ اتِّصَالِ .

-" আমি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি জগতকে আমার হাতের তালুতে রাখা একটি সরিষার দানার মত দেখি।"

একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন

এ ক্ষেত্রে কিছু লোক এমন ধারণাও পোষণ করে যে, যখন দূর থেকে কাউকে কোন কাজের জন্য আহবান করা হয় তখন বুঝা যায় যে, তিনি সেখান থেকেই জানতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারেন, কে তাঁকে ডাকছে। তখন তিনি আহবানকারীকে চিনতে পারেন। এর ভিত্তিতে বুঝা যাচ্ছে যে তাঁর কাছে ইলম গায়ব (অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান) আছে। যেহেতু ইলমে গায়ব থাকা কেবল আল্লাহ তায়ালারই ক্ষমতার অংশ তাই উক্ত দুটি কারণে এটা (ইস্তি গাছা) শিরক ও হারাম।

উক্ত কথার সরল জবাব হচ্ছে, আমরা এ যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলস্বরূপ এ ধরনের ইলম সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছি। অন্যদিকে কালামে মাজীদ ফুরকানে হামীদে এ দুটি গুণ গায়রুল্লাহর জন্য প্রমাণিত। তথাপি তা শিরক নয় বরং আল্লাহর কালাম। এতে দূর থেকে জানা, কাজ করার ক্ষমতা উভয়ের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

'সুরা নামল'-এ সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ) তার সভাসদের সাথে আলোচনার মধ্যে বলেন-

يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

-"হে পরিষদবর্গ, তারা আত্মসমর্পন করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে।" (আন নামল, ২৭ঃ৩৮)

বিলকীসের সিংহাসন ছিলো সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ)-এর দরবার থেকে নয়শত মাইল দূরে। যা দরবারের কেউ দেখেও নি। তারপরও কেউ তাঁর কাছে এটা জিজ্ঞাসা করলেন না, 'হে সুলাইমান (আঃ), সিংহাসন তো শত শত মাইল দূরে। দৃষ্টির বাইরে। আপনি বলছেন তা দরবারে হাজির করতে। আপনি কি আমাদের সম্পর্কে এ আকীদা পোষণ করেন যে, আমরা এখানে বসেই দূরের বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখি? আমাদের কাছে ইলমে গায়ব আছে?

মাখলূকের কাছে দূরের ইল্‌ম থাকতে পারে?

যদি সুলাইমান (আঃ) এ আকীদা পোষণ করতেন যে, নয়শত মাইল দূরে থাকা বিলকীসের সিংহাসন সম্পর্কে তার সভাসদদের মধ্যে কোন ধারণা নেই অর্থাৎ তা কোন্ জায়গায় এত দূরে গিয়ে তা কিভাবে আনা যাবে তাহলে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন না কে নিয়ে আসবে? আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ করতেন, "হে আল্লাহ! বিলকীসের সিংহাসন আমার কাছে এনে দাও। কেননা তুমিই সর্বশক্তিমান।"

সংক্ষেপে কুরআন মাজীদ থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই-দূরের বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া শিরকের পর্যায়ে পড়ে না। সুতরাং যদি সুলাইমান (আঃ) এ বিশ্বাস রাখেন, তাঁর উপর ভিত্তি করে সভাসদদেরকে সিংহাসন হাজির করার নির্দেশ দেন তারপরও তিনি

মুশরিক না হন তাহলে যদি বর্তমান যুগের মুসলমানরা এ আকীদা পোষণ করেন যে,গাউছে আযম শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রাঃ), দাতা গঞ্জ বখশ আলী হাজভীরি (রাঃ), হযরত সুলতানুল আরিফীন সুলতান বাহু (রাঃ) সহ অন্যান্য আউলিয়ায়ে কামিলীন ও সুলাহায়ে ইজাম (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) প্রমুখ আমাদের সম্পর্কে জানেন এবং আমাদের দূরাবস্থা আল্লাহর হুকমে শোনার ক্ষমতা রাখেন তাহলে কীভাবে শিরক হবে? যে সব কারণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ব্যাপারে শিরক হয়নি একই কারণে এখানেও শিরক হবে না। কেননা আউলিয়ায়ে কিরামকে প্রদত্ত 'কাশ্‌ফ'ও সে মহান সত্ত্বাই দান করেছেন যিনি সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারের লোকদের বিশেষতঃ "আসিফ বরখিয়া" কে দান করেছেন। এখনও সর্বশক্তিমান সে মহান সত্ত্বাই আছেন যিনি সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ)-এর যুগে ছিলেন। তাই বর্তমানেও শরীয়তের আহকাম অভিন্ন থাকবে। ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, আকীদা সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন?

কাশ্‌ফে ফারূকী

আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাদেরকে প্রদত্ত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে তাদের এবং অজ্ঞাত বস্তু-স্থানের মধ্যকার সকল আবরণ দূর হয়ে যায়। এটা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের বিশেষ দানের অন্তর্ভুক্ত রূহানী ফয়জেরই পূর্ণতা ছিল যে, তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কোন প্রকার বস্তুগত মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়াই হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ইসলামী সেনাবাহিনীর অধিনায়ককে দিক নির্দেশনা দানে সক্ষম ছিলেন। সাইয়িদুনা সারিয়াহ ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাবাহিনী ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে সারিবদ্ধভাবে লড়ছিলেন।

ওদিকে শত্রুরা কৌশলে মুসলিম সৈন্যদলকে ঘেরাও করে অতর্কিত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সময় খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়িদুনা উমার ফারুক (রাঃ) মদীনা মুনাওওয়ারায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। রূহানী দৃষ্টির বদৌলতে যুদ্ধের ময়দানের নকশা তাঁর সামনে ছিল। খুতবা চলার সময়েই উচ্চস্বরে ডাক দিলেন,

يَاسَارِيَ الْجَبَلَ

-"হে সারিয়া! পাহাড়ে উঠে যাও।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ৫৪৬)
(দালাইলুন্ নুবুওওয়াত লি আবী নুআইমঃ ৫০৭)
(কান্‌যুল উম্মাল, ১২ঃ ৩৫৭৮৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

এটা বলেই তিনি পুনরায় খুতবার মধ্যে মশগুল হয়ে গেলেন। হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত মসজিদে নববীতে জুমুআর খুতবাও দিচ্ছেন আবার তার সিপাহসালারকে যুদ্ধের মাঠে দিক নির্দেশনাও দিচ্ছেন। তাঁর কাছে না কোন রেডিও ছিল না কোন মোবাইল ফোন-যার দ্বারা যুদ্ধের ময়দানের খবরাখবর যথাসময়ে পাওয়া সম্ভব। এটা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের প্রদত্ত রূহানী শক্তি ও ক্ষমতা। যার মাধ্যমে তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু দেখতে পেয়েছেন।

হযরত সারিয়া ইবনে জাবাল (রাঃ) সাইয়িদুনা ফারূকে আজম (রাঃ)-এর ডাক শুনলেন এবং তার নির্দেশমতো পাহাড়ে আরোহন করে বিজয় ছিনিয়ে আনলেন। শত্রুদের হামলা ব্যর্থ হয়ে গেলো। মুসলিম সেনাবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের ফলে বিজয় তাদের পদচুম্বন করলো।

কাশ্‌ফ ও ইলমে গায়বের পার্থক্য

এখানে আমরা একটি বিভ্রান্তির নিরসন করতে যাচ্ছি। কাশফ ও ইলমে গায়ব দুটি ভিন্ন বিষয়। ইলমে গায়বের বিপরীতে কাশফের মধ্যে কেবলমাত্র কোন অজ্ঞাত বস্তু থেকে পর্দা-আবরণ সরে যাওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। আর তা শুধুমাত্র মাখলূকের জন্যই প্রয়োজন। আল্লাহ্ তায়ালার জন্য তো কাশ্‌ফ নামের কোন কিছুর কল্পনাও অসম্ভব। কেননা তিনি হচ্ছেন, 'আলিমুল গায়বি ওয়াশ্ শাহাদাতি।' যেহেতু তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন বা পর্দাবৃত নয় তাই কাশ্‌ফ তথা পর্দা উন্মোচনের প্রশ্নই আসে না।

কাশ্‌ফের সম্পর্ক আল্লাহর অলিদের দিকে হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সৎ ও পূণ্যবান বান্দাদের যে যোগ্যতা প্রমাণিত হয় তা আল্লাহর জন্য কল্পনা করাও শিরক। যে বিষয়কে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা অসম্ভব তাকে গায়রুল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করলে শিরক হবে কিভাবে?

অলিদের কাছে গায়বের বিষয়গুলো পর্দাবৃত থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা ঐ পর্দাগুলো উন্মোচিত করে দেন। এটাই হলো তাওহীদের শিক্ষা। শিরক বলা শুধুমাত্র তখনই সঠিক হতে পারে যখন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের গুণাবলী ও অনুপম শানকে গায়রুল্লাহ্‌র জন্য ব্যবহার করা হয়। পৃথিবী, আকাশ এবং সুবিস্তৃত আসমানী জগতের কোথাও এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে গোপন। যেসব বস্তু তার বান্দাদের কাছে গায়ব তথা দৃষ্টির বাইরে তিনি তাও জানেন। আবার যা প্রকাশ্য তার ইলমও তাঁর কাছে আছে। আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ-

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

-"আল্লাহর নিকট আসমান ও জমীনের কোন বিষয়ই গোপন নয়।" (আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫)

এ আয়াতে মুবারাকার আলোকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য কাশ্‌ফ'র বিশ্বাস রাখা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালার অসীম ক্ষমতা ও ইলমে গায়বকে সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়ার নামান্তর। যা কখনোই তাওহীদের দাবী হতে পারে না। কেননা কাশফের মধ্যে একটি গুপ্ত রহস্যকে প্রকাশিত করার অর্থ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। আম্বিয়া ও আউলিয়ার জন্য পর্দা ছিলো। আল্লাহ্ তা উন্মোচন করে দিয়েছেন। সমস্ত পর্দা, আবরণ দূর হওয়ার কারণে তাঁরা দূরের ও কাছের বস্তু সম্পর্কে জানেন।

(ইলমে গায়ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের প্রণীত 'কুরআন ওয়া সুন্নাত আওর আকীদায়ে ইলমে গায়ব' গ্রন্থটি দেখুন)

নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির যোগ্যতার প্রমাণ

কুরআন মাজীদে বর্ণিত উক্ত ঘটনায় সাইয়িদুনা সুলাইমান (রাঃ) তাঁর দরবারের লোকদের কাছে এ ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, "বিলকীসের সিংহাসন নিয়ে আসো।" এরপর শর্তারোপ করলেন, قَبْلَ أَنْ يَأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ "তারা অনুগত হয়ে আমার কাছে উপস্থিত হওয়ার আগে।" 'সাবা' সাম্রাজ্য ও তাদের সঙ্গে আরো অনেকেই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দরবারের উদ্দেশে রওয়ানা হন। তাঁরা মুসলমান হওয়ার জন্যই আসছিলেন। সুলাইমান (আঃ) ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁরা দরবারে পৌছার আগেই যেন সিংহাসনটা এখানে নিয়ে আসা হয়।

যদি হযরত সুলাইমান (আঃ) গায়রুল্লাহর জন্য দূরের বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া ও তা নিয়ে আসার শক্তি ও ক্ষমতার উপর বিশ্বাস না রাখতেন তাহলে কখনো এধরনের প্রশ্ন করতেন না। বরং সভাসদরাও জবাব দিতো, "হে হযরত সুলাইমান (আঃ), মাখলূকের দ্বারা এমন কাজ করা কিভাবে সম্ভব? আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ করুন। কারণ শুধুমাত্র তিনিই অলৌকিক বিষয়ের ক্ষমতা রাখেন।" কিন্তু সভাসদদের মধ্যে কারো কাছ থেকে এ ধরনের ধৃষ্টতা পূর্ণ কথা শোনা যায়নি। বরং এর জবাবে জনৈক 'জ্বিন' দাঁড়িয়ে বললো-

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ —

-"জনৈক দৈত্য জিন বললো। আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি এ কাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত।" (আন্ নামল ২৭ ঃ ৩৯)

এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, যে বিষয় জিনদের জন্য বৈধ তা আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় ও তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত মানুষদের জন্য কিভাবে শিরক হতে পারে? শিরক তো ঐ সব

pdf By Syed Mostafa Sakib

খোদায়ী গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য গায়রুল্লাহর জন্য ব্যবহারের মাধ্যমে জন্ম নেয় যা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের জন্যই নির্দিষ্ট। এবং তিনি ছাড়া আর কারো কাছে এ ধরনের গুণাবলী থাকতে পারে না।

সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ) উক্ত জ্বিনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। এরপর মানুষের মধ্য থেকে এমন এক বান্দা দাঁড়ালেন যাঁর কাছে ছিল কিতাবের ইলম। তিনি ওলামায়ে কিরাম ও রূহানী শক্তি সম্পন্ন মানুষদের একজন ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর কাছে আরজ করলেন,

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ —

-"আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ।" (আন্ নামল ২৭ ঃ ৪০)

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে একদিকে একজন মাখলূকের (জিন) বর্ণনা রয়েছে যার ছিল আপন শক্তি ও ক্ষমতার উপর প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস। যিনি নিজ ক্ষমতায় শত শত মাইল দূরে পড়ে থাকা সিংহাসনকে বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার আগেই হাজির করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদিকে এক আল্লাহ ওয়ালার (মানুষ) শান বর্ণনা করা হচ্ছে যিনি কাজটি চোখের পলকেই শেষ করার যোগ্যতা রাখেন। তখন সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ) ডাক দিলেন,

لِيَبْلُوَنِيْٓ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ —

-"যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত, কৃপাশীল।" (আন্ নাম্‌ল ২৭ ঃ ৪০)

অদৃশ্য ক্ষমতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তিকে কখনো এভাবেও তুলে ধরা হয় যে, বান্দার কাছে তার সামর্থের বাইরের বস্তু চাওয়া বৈধ নয়। এমনকি ইস্তিগাছাকে হারাম প্রমাণ করার জন্য এ ধারণাও পোষণ করা হয় যে, আম্বিয়া, আউলিয়া ও সুলাহার কাছে বান্দার সামর্থের বাইরে বস্তু কামনা করা শিরক। এর জবাব

বিস্তারিত ভাবে দেয়া হয়েছে। মূলতঃ এ ধারণা ইস্তিগাছার পদ্ধতি সম্পর্কে না বুঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা কোন মুসলমান সাহায্য প্রার্থনা করার সময় কখনো নিজেদের অন্তরে এ আক্বীদা রাখে না যে, মাজাযী সাহায্যকারীগণ (অর্থাৎ নবী ও অলীগণ) আপন ক্ষমতায় আমাদেরকে সাহায্য করবেন। বরং আমাদের অন্তরের ইচ্ছা থাকে যে, তাঁরা আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমাদের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যম ও ওয়াসীলা হবেন। যেমন অন্ধ সাহাবীর (রাঃ) ঘটনা ও বৃষ্টির জন্য সাহায্য প্রার্থনার বর্ণনায় স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখিত সাহাবীগণ (রাঃ) আল্লাহ্ তায়ালাকে মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার মালিক) এবং সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসিত গুণাবলীকে ওয়াসীলা মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন করেছেন। যার ফলস্বরূপ মুওয়াহ্হিদে আকবার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (সর্বোত্তম তাওহীদবাদী) যিনি তাওহীদ সম্পর্কে আমাদের চাইতে বেশী অবগত তিনি সাহাবীদের কিরামকে বাধা দান এবং শিরক বলার পরিবর্তে তাদের জন্য দুআ করেছেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্যা দূর করে দিয়েছেন। যদি বান্দার সামর্থের বাইরের ব্যাপারে গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া শিরক হতো তাহলে-

প্রথমতঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এ ধরনের আবেদন করতেন না।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে এ ধরনের শির্ক সম্পর্কে সতর্ক করতঃ সব সময়ের জন্য এ ধরনের আবেদনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মাহবূব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাঁদের সাহায্য করতে নিষেধ করতেন এবং শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতেন। সাহাবায়ে কিরামের সাহায্য প্রার্থনা, প্রত্যুত্তরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ কাজে বাধা না দেওয়া এ তিনটি মিলে এটা প্রমাণ করে যে, সাহায্য প্রার্থনা কেবল বৈধ নয় বরং সাহাবীদের (রাঃ) সুন্নাত এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। মুজিযা কামনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত। যখন কাফির ও মুশরিকরা তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মুজিযা হিসেবে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক কার্যাবলী দেখতে চাইলো তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ কাজগুলোকে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত না করে স্বীয় পবিত্র হাতে প্রার্থীত মুজিযা সমূহ (চন্দ্র বিদারণ ইত্যাদি) প্রকাশ করলেন। যদি বান্দার জন্য দুঃসাধ্য এসব কাজ (চাওয়া ও প্রকাশ করা) শিরক হতো তাহলে শেষ যুগের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়া কীভাবে সম্ভব ছিলো? যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাজ শিরক নয় (যার কল্পনা ও ইসলামের গণ্ডি

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে বের করে দেয়) তাহলে সাহাবায়ে কিরামের সুন্নাতের উপর আমল করতে গিয়ে উম্মত কর্তৃক এ ধরনের কাজ প্রার্থনা করা শিরক হবে কিভাবে?

মুসলমানরা সব সময় নবী ও অলীগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সময় এ বিশ্বাস রাখে যে, তারা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সুপারিশ ও দুআ করে আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। এটাই আমাদের আকীদা। সমস্ত মুসলিম উম্মাহর আকীদা এটা।

যদি কেউ এভাবে ইস্তিগাছা করে যে, হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমাকে আরোগ্য দান করুন, আমার কর্জ আদায় করার ব্যবস্থা করে দিন তাহলে এর অর্থ হবে-রোগ নিরাময় ও কর্জ পরিশোধের ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে সুপারিশ করুন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের দুআ ও সুপারিশ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। এ ধরনের কথার মাধ্যমে কাজের সম্পর্ক মাজাযে আকলী হিসেবে গণ্য হবে। এতে কোন বাধা নেই। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা স্বয়ং কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ –

-"পবিত্রতা তাঁর জন্য, যিনি সব জোড়া সৃষ্টি করেছেন ওই সব বস্তু থেকে, যে গুলোকে ভূমি উৎপন্ন করে।" (ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৬)

কুরআন মাজীদে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা মাটিকে উদ্ভিদের উৎপাদনকারী বলেছেন। অথচ উদ্ভিদ উৎপন্ন করার শক্তি মাটির নেই। মাটি কেবল উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যম।

এ আয়াতে মুবারাকা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াসীলা ও মাধ্যমকে কর্তা বলার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এখানে বিশুদ্ধ অর্থ নেয়ার জন্যই মাজাযী আকলী নেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। এখানে হারাম হওয়ার কোন কারণ নেই। এ অর্থে মুসলমানরা যেসব বাক্য ব্যবহার করে থাকে তা শিরক থেকে এমনভাবে মুক্ত যেভাবে মুক্ত আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কালামে মাজীদ ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতময় হাদীস সমূহ।

চতুর্থ আপত্তি
আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নেই

কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে করীমায় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছে বিলায়ত ও সাহায্য করার ক্ষমতা নেই বলা হয়েছে সেসব আয়াতের ভিত্তিতে কারো মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করাকে হারাম বলা হয়। এমনও বলা হয় যে, বিলায়াত ও

সাহায্যের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা। আল্লাহর ক্ষমতাকে অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা শিরক।

যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইরশাদ -

1- وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ –

-"আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।" (আল বাকারাহ, ২ ঃ ১০৭)

2- وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا –

-"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।" (আল আহযাব, ৩৩ ঃ ১৭)

3 – وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ –

-"তিনিই কার্যনির্বাহী, প্রশংসিত।" (আশ্শূরা ৪২ ঃ ২৮)

4- مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ –

-"তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।" (আল বাকারাহ, ২ ঃ ১২০)

5-وَكَفٰى بِاللهِ وَلِيًّا وَّكَفٰى بِاللهِ نَصِيْرًا –

-" আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট।" (আন নিসা, ৪ ঃ ৪৫)

6- وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ –

-"আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না।" (আল আনফাল, ৮ ঃ ১০)

7- وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا –

-"দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।" (বনী ইসরাঈল ঃ ১৭ ঃ ৮০)

8 – وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا –

-"আপনার জন্য আমার পালনকর্তা পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।" (আল কুরআন, ২৫ ঃ ৩১)

উপরোল্লিখিত সকল আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে হাক্বীক্বি অর্থের উপর কিয়াস (অনুমান) করে এ দলীল উপস্থাপন করা হয় যে, আয়াতগুলোতে আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তায়ালার জন্য ولى (অলী) نصير (নাছীর অর্থাৎ সাহায্যকারী) سلطان (সুলতান) ও هادي হাদী) অর্থাৎ পথ প্রদর্শক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই উক্ত গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে । অন্তর্ভুক্ত করা শিরক।

ভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন

কুরআন মাজীদে কিছু শব্দ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ব্যবহার করার অর্থ এটা কখনো নয় যে, ঐ শব্দগুলো গায়রুল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করলে শির্ক হবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কিছু উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

যেমন কুরআন মাজীদে যেখানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের জন্য ولى (অলি), نصير (নাছীর) ইত্যাদি শব্দ এসেছে সেখানে তার বান্দাদের জন্যও মাজাযী (রূপক) হিসেবে একই শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। আমরা এখানে কলেবর বৃদ্ধি না করে কেবল ولى ও نصير শব্দ সম্বলিত আয়াতসমূহ উপস্থাপন করছি। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালার অন্যান্য অনেক সিফাতও (যেমন سمع ، بصير ও شهيد ইত্যাদি) কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্র ইরশাদ-

1- وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَل لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا —

-"আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।" (আন্ নিসা, ৪ ঃ ৭৫)

2- اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا —

"তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ।" (আল মায়িদাহ, ৫ঃ৫৫)

3- وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ —

"আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করো তবে জেনে রেখ, আল্লাহ, জিবরীল এবং সৎকর্মপরায়ন মুমিনগণ তার সহায়।" (আত্ তাহরীম, ৬৬ঃ৪)

4- وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ —

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক।" (আত্ তাওবা, ৯ ঃ ৭১)

উক্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, ولى ও نصير এবং এ ধরণের অন্য যে সব শব্দ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালার সিফাত হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে-আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের জন্য সে শব্দ ও সিফাত ব্যবহার করা শুধুমাত্র মাজায হিসেবে বৈধ তা নয় বরং আল্লাহ তায়ালার সুন্নাত (রীতি)। আল্লাহ তায়ালার সুন্নাতকে শিরক আখ্যায়িত করা ইসলামী শিক্ষা ও দর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নামান্তর। ইসলামের আহকাম কখনো এ শিক্ষা দেয় না।

পঞ্চম আপত্তি

প্রার্থনা ও সাহায্য কামনা শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই জায়েয

ইস্তিগাছা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে মুবারাকের মাধ্যমে একটি ভ্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। ঐ হাদীসে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে মুবারাকের শব্দগুলো নিম্নরূপ-

اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينفعك بشى لم ينفعك الابشى قد كتبه الله لك ، ولواجتمعوا على أن يضروك بشى لم يضروك الابشى قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف —

-"যখন তুমি প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছেই করবে। যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছেই চাইবে। জেনে রাখো! যদি সকল উম্মত মিলে তোমার উপকার করতে চায় তবুও আল্লাহর প্রদত্ত তাকদীরের বিপরীতে তা করতে পারবে না। একইভাবে যদি সকল উম্মত মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায় তখনও আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির বিরুদ্ধে সফল হতে পারবে না। (কেননা নিয়তির লেখকের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লেখাগুলো শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।" (জামিউত্ তিরমিযী, আবওয়াবুয্ যুহদি, ২ ঃ ৭৪)

নিম্নে আমরা একথাটি স্পষ্ট করবো যে, হাদীসে মুবারাক থেকে যে মাসআলা উদ্ভাবন করা হয় অর্থাৎ 'শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা ও ইস্তিগাছা বৈধ, অন্য কারো কাছে কৃত প্রার্থনা ও ইস্তিগাছা শিরকে লিপ্ত করার কারণ' -কথাটি সম্পূর্ণ ভুল।

প্রার্থনা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ

উক্ত ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শনের দ্বারা মাধ্যম গ্রহণ করার পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হলো। প্রার্থনা, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাছার ব্যাপারে বর্ণিত কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনর্থক হয়ে গেলো। এধরনের প্রমান উপস্থাপন কুরআন হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুরআন অবতরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে না জানা এবং ইসলামী শিক্ষার গভীর অধ্যয়নের অভাবেই সম্ভব হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি শিরক ও কুফরের অপবাদ দেয়া। বাস্তবতা হচ্ছে, এ হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে প্রার্থনা ইস্তিগাছা ও ইস্তিআনা হারাম হওয়া উদ্দেশ্য নয়। যা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়। বরং এ হাদীসের লক্ষ্য হচ্ছে, বান্দার দৃষ্টিকে মাধ্যম থেকে সরিয়ে মূল লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিবদ্ধ করা যাতে বান্দা ইস্তিগাছার মাধ্যম বা ওয়াসীলার (মাজাযী মুস্তাগাছ) কল্পনায় বিভোর হয়ে হাক্বীক্বি মুস্তাগাছকে ভুলে না যায়। তাই অন্যান্য ইসলামী শিক্ষার আলোকে এ হাদীসের অর্থ হবে, হে বান্দা যখন তুমি আল্লাহর কোন মাখলূকের কাছে আবেদন, ইস্তিআনাত ও ইস্তিগাছা করবে তখন আল্লাহর সত্ত্বা ও পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর পূর্ণ ভরসা রাখো, তাকেই হাক্বীক্বি মুস্তাগাছ মনে করে প্রার্থনা করো। এ মাজাযী (রূপক) মাধ্যমগুলো যেন তোমাকে সমস্ত কার্যকারণ ও মাধ্যমের স্রষ্টা থেকে বিমুখ না করে। তোমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা বা আড়াল হয়ে না দাঁড়ায়।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ হাদীসে ইসলামের ইস্তিআনাত ও সাহায্য প্রার্থনার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন নাই বরং বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের বিপরীতে কোন ইস্তিগাছা সম্ভব নয়। এতে আল্লাহর দরবারে ওয়াসীলা হয়ে কারো প্রয়োজন পূরণ করার অস্বীকৃতি কোথায়? আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা এবং তাঁর কথামতো কাজ করার মধ্যে আসমান জমীনের ব্যবধান। একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? হাদীসে মুবারকের শেষোক্ত শব্দাবলী جفت الصحف ও رفعت الاقلام (কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে লেখাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে) এ কথাকে স্পষ্ট করছে যে, অন্যের মাধ্যমে ইস্তিগাছা নিষিদ্ধ শুধুমাত্র আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের বিপরীতেই।

এ হাদিসটি আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বর্ণিত হয়েছে। প্রার্থনা ও ইস্তিগাছা থেকে বাধা দানের জন্য নয়। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়ার নির্দেশ বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

-"অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি তোমাদের জানা না থাকে।" (আন নাহল ১৬ ঃ ৪৩)

উল্লেখিত আয়াতে করীমায় মুমিনদেরকে আহলে যিকর তথা জ্ঞানবানদের কাছে জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতে করীমা ছাড়াও উক্ত অর্থে বর্ণিত অসংখ্য

হাদীসে নববীর মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয় যে, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ এর উদ্দেশ্য ও অর্থ অন্যের কাছে প্রার্থনার শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা নয় বরং এর অর্থ হচ্ছে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে যেন রাজা বাদশাহদের কাছে ধন-সম্পদ, ক্ষমতাবানদের কাছে সম্মান ও পদ চাওয়া না হয়। আল্লাহ তায়ালার কাছেই দয়া-অনুগ্রহ-সম্মান ইত্যাদি প্রার্থনা করা হয়। এ হাদীস থেকে অন্যের কাছে 'যাচনা' করা হারাম-এ অর্থ নেয়া কখনোই সঠিক নয়। وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ এর মধ্যে অন্যের কাছে যাচনা করা অর্থাৎ ইস্তিগাছা ও তাওয়াস্‌সুল হারাম হওয়ার কোন দলীল নেই। বরং অসংখ্য হাদীসে এসেছে যে, সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহুবার সাহাবীদেরকে স্বয়ং প্রার্থনার উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছেন। (যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে)।

যদি অন্যের কাছে চাওয়া শিরক হয় তাহলে ছাত্র শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন করা, রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করা, অভাবী লোক সচ্ছল মানুষের কাছে ভিক্ষা করা এবং কর্জ গ্রহীতার কাছে কর্জ ফেরত চাওয়া সবই শিরক ও নিষিদ্ধের অন্তর্ভূক্ত হবে।

আরো কিছু চাও

সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একজন সৌভাগ্যবান সাহাবী সাইয়িদুনা রাবিআ ইবন কা'ব (রাঃ) এক রাতে তাঁর পবিত্র খিদমতে ছিলেন। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে উযু করার জন্য পানি দিলেন এবং তাকে উযু করিয়ে দিলেন। এ খিদমতের কারণে মালিকে কওন ও মকাঁ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশী হয়ে হযরত রাবিআ (রাঃ) কে বললেন, (سل) "অর্থাৎ চাও যা তোমার যা ইচ্ছা।" এত বড় সুযোগ পেয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্ত সাহাবী সাহিবে লাও-লাকা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চিরদিন তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। যা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবুল করলেন। হযরত রাবিআ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন-

كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي " سل ،، فقلت أسألك مرافقتك فى الجنة" قال : " أوغيرك" قلت : " هو ذالك ،، قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود ،، -

pdf By Syed Mostafa Sakib

-"আমি রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একটি রাত অতিবাহিত করেছি। (এবং শেষ রাত্রিতে) তাঁর উযু ও হাজত পূরণের জন্য পানি দিয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন 'তুমি চাও' (তোমার যা ইচ্ছা)। আমি আরজ করলাম, আমি চিরস্থায়ীভাবে বেহেশতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এছাড়া আর কিছু? আমি আরজ করলাম, এটাই যথেষ্ট। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে বেশী বেশী সিজদা করার মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করো।"

(আস্ সহীহ লি মুসলিম, সালাত অধ্যায় ১ ঃ ১৯৩)
(সুনানে আবু দাউদ, সালাত অধ্যায় ১ ঃ ১৯৪)

এ হাদীসে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই তাঁর সাহাবীকে (রাঃ) চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি গায়রুল্লাহর কাছে চাওয়া হারাম হতো তাহলে সবচেয়ে বড় তাওহীদবাদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনটি করতেন না। হাদীসের শেষোক্ত শব্দগুলোতে তিনি নিজেই তাঁর সাহাবীর কাছে অত্যধিক সিজদার মাধ্যমে সাহায্য চেয়েছেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও সাহায্য চাওয়া মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত হিসেবে সঠিক। এর বিপরীত ফাতওয়া দেয়া কোন তাওহাদীবাদীর চরিত্র হতে পারে না। এ ধরনের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিপূর্ণ চিন্তা-চেতনা ইসলামের বিশ্বজনীন শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফসল।

সাহায্য প্রার্থনা স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালার দরবারে অভাব পূরণ ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য আল্লাহর প্রিয় মাখলূক এবং তাঁর পছন্দনীয় আমল-কাজের মাধ্যমে ইস্তিগাছা করা আল্লাহর নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে এর কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

(১) কালামে মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ –

-"তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। (আল বাকারাহ, ২ ঃ ৪৫)

এখানে ধৈর্য ও আমল ইত্যাদি ভাল আমলগুলোর মাধ্যমে ইস্তিআনাতের নির্দেশ এসেছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। এতে মুমিনদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে,

ধৈর্য ও নামাযের ন্যায় ভাল আমলগুলোকে ওয়াসীলা ও মাজাযী মুস্তাআন বানিয়ে হাক্বীক্বি মুস্তাআন আল্লাহ্ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

(২) এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে করীমা দেখুন-যাতে যুদ্ধের জন্য হাতিয়ারের ইস্তিগাছা এবং জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালার ইরশাদ -

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ –

-"আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে।" (আল্ আনফাল, ৮ ঃ ৬০)

(৩) তাছাড়া আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা হযরত যুল ক্বারনাইন সম্পর্কেও কুরআন মাজীদ স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে। তিনি শত্রুর মোকাবিলায় নিজ সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কুরআন করীমের ইরশাদ-

فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ –

-"অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো।" (আল কাহফ, ১৮ ঃ ৯৫)

(৪) কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য দলীলের মাধ্যমে প্রমাণিত সালাতুল খাওফ (ভয়ের নামায)ও মাজাযী ইস্তিগাছার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ এটা শরীয়ত সম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মাখলূক কর্তৃক গায়রুল্লাহর কাছে ইস্তিআনা করার বিধান রয়েছে।

(৫) হাদীস শরীফে সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহুবার মুমিনদেরক পরস্পর সাহায্য ও ইস্তিআনা করার নির্দেশ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। ইরশাদ করেন-

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ –

-"যে আপন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মা' আলিম, ১ ঃ ১৩০)
(আস্ সহীহ লি মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস্-সিলাহ্ ২ ঃ ৩২০)

(৬) অন্য একটি হাদীসে কথাটা কিছুটা ভিন্নভাবে এসেছে-

وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ –

pdf By Syed Mostafa Sakib

-"আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করে।" (আস্ সহীহ লি মুসলিম, কিতাবুয্ যিকর, ২ ঃ ৩৪৫)
(জামিউত তিরমিযী, আব্ওয়াবুল কিরাআত, ২ ঃ ১১৪)

(৭) ইমাম হাকিম (রাহঃ) স্বীয় মুসতাদরাকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে পরস্পর সাহায্য ও প্রয়োজন পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ বরকতময় আমলের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لأن يمشى احدكم مع أخيه في قضاء حاجة افضل من أن يعتكف في مسجدى هذا شهرين

-"তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের সাথে সাহায্যের জন্য যাওয়া আমার মসজিদে দু'মাস ইতিকাফ করার চেয়ে উত্তম।" - (আল্ মুসতাদরাক, ৪ ঃ ২৭০)

(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩ ঃ ৩৯১)

(৮) আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিপদ ও সমস্যা দূরীকরণ ও প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ করে এমন একটি মাখলূক সৃষ্টি করেছেন যারা দুঃখী মানুষের সেবা ও তাদের সাহায্য করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকেন। হাদীসে এসেছে-

اِنَّ لِلّٰهِ خلقا خلقهم لحوائج الناس تفزع الناس اليهم في حوائجهم اولئك الآمنون من عذاب الله –

-"আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি মাখলূক সৃষ্টি করে রেখেছেন যাতে মানুষ প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের শরণাপন্ন হতে পারে। তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত।" (মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ৮ ঃ ১৯২)

(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩ ঃ ৩৯০)

এ হাদীসে সরওয়ারে দু'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উচ্চারিত শব্দাবলী"মানুষ নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের শরণাপন্ন হয়" বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মানুষ ইস্তিআনা ও ইস্তিগাছার নিয়তে আল্লাহর উক্ত মাখলূকের শরণাপন্ন হওয়াকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুস্তাহসান বলেছেন। দ্বীন সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানের কারণে তাকে হারাম এমনকি শিরক বলা হচ্ছে।

(৯) এ প্রসঙ্গে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসের শব্দাবলী এরকম-

ان لله عند اقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا في حوائجهم الناس ما لم يملوا فاذا ملوا نقلها الى غيرهم –

-"আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে তাঁর নি'মাত রেখেছেন। ঐ বান্দারা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিয়োজিত থাকেন। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন এ দায়িত্ব অন্য কাউকে দেয়া হয়।" - (মু'জামুল আওসাত, ৯ ঃ ১৬১)
(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, ৩ ঃ৩৯০)

উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মাখলূকের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য প্রার্থনা ও ইস্তিগাছার ফলে তাদের পক্ষ থেকে সাহায্য আসা আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা। যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সকল মুসলিম উম্মাহ সর্বযুগে এ নির্দেশ পালনে লাব্বায়ক বলেছেন। যেটা কখনোই শিরক বিদ'আত হতে পারে না। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো কেবল ইস্তিগাছার বৈধতা নয় বরং আল্লাহর নির্দেশের পর্যায়ে পড়ে।

ষষ্ঠ আপত্তি

সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনার নিষেধাজ্ঞা

সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জাহেরী জীবনে এক মুনাফিক মুসলমানদেরকে কষ্ট দিত। তাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়ার দুরভিসন্ধিতে থাকত। সাইয়িদুনা সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, আসো আমরা সবাই মিলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে এ মুনাফিকের বিপক্ষে ইস্তিগাছা করি। যখন একথা সরওয়ারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে পৌছলো, তখন তিনি বললেন,

اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي وَاِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللّٰهِ –

-"আমার কাছে ইস্তিগাছা করা যায় না। শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই ইস্তিগাছা করা যায়।" (মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ১০ ঃ ১৫৯)

এ পবিত্র হাদীসের অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়া এবং বর্ণিত হাদীসের উদ্দেশ্য না জানার কারণে কিছু লোকের ধারণা হচ্ছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে ইস্তিগাছাকে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তাই এখন যদি কেউ গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তাহলে মুশরিক বলে বলে গণ্য হবে।

হাদীসে মুবারাকের বিশুদ্ধ অর্থ

এ একটি হাদীসকে তার হাক্বীক্বি অর্থে রেখে অসংখ্য আয়াত, হাদীস ও সাহাবীদের আমলের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। যে সব আয়াত ও হাদীসে স্পষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে ইস্তিগাছার হুকুম পাওয়া যায় (তন্মধ্যে একটির বিস্তারিত বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে) এ হাদীসের । হাক্বীক্বি অর্থের উপর আমল করলে উক্ত সকল আয়াত ও হাদীসকে তাকের উপর তুলে রাখা ছাড়া উপায় নেই। ইসলামী শরীয়তের সর্বজনবিদিত মূলনীতি হচ্ছে, যখন কোন হাদীসে কুরআন মাজীদ বা অন্যান্য হাদীসে মুতাওয়াতিরের বিরোধী আহকাম পাওয়া যায় তাহলে উভয়ের মাঝখানে সামঞ্জস্যতা বিধানের চেষ্টা করতে হবে। আর যদি হাক্বীক্বি অর্থ গ্রহণ করলে সামঞ্জস্যতা বিধান করা সম্ভব না হয় তখন বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উক্ত মত বিরোধ সম্পন্ন হাদীসকে মাজাযী অর্থে প্রয়োগ করে স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসগুলোর সাথে এর বিরোধ মীমাংসা করতে হবে। এখানেও উক্ত মূলনীতি অনুসরণীয়।

এখানে উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৌলিক আকীদার মধ্যে তাওহীদের হাক্বীক্বত তথা বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর তা হচ্ছে হাক্বীকি দাতা ও সাহায্য প্রার্থনার উপযুক্ত শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। মানুষ হচ্ছে ইস্তিগাছার মধ্যে শুধুমাত্র ওয়াসীলা ও মাধ্যম।

এ হাদীসটি কেবলমাত্র জীবিত লোকদের কাছে ইস্তিআনা ও ইস্তিগাছা নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ নির্দেশ করে না যেমনটি কিছু লোকের ধারণা। বরং বাহ্যিকভাবে এ হাদীসে তো জীবিত, মৃত সকল গায়রুল্লাহর কাছে ইস্তিগাছাকে সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা আমরা পূর্বে বিশ্লেষণ করেছি।

কোন কোন সময় আল্লাহ ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা থেকে কিছু লোক প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে থাকে। তখন অন্যান্য স্থানে তার গ্রহণকৃত উক্ত মতের বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। মুনাফিকের কষ্ট দানের কারণে সাইয়িদুনা আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কর্তৃক তার বিরুদ্ধে হুযূর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ইস্তিগাছাও একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

যদি উক্ত হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা না হয় তাহলে হাদীসের সাথে অন্যান্য আয়াত, হাদীস ও সাহাবীদের আমলের বিরোধ আবশ্যক হয়ে পড়ে। হাদীস গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাঁর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা দু'আ করাতেন। তাঁর মহান ওয়াসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তাঁরা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাধ্যমে ইস্তিগাছার ক্ষেত্রে সকল উম্মতের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর উক্তি উল্লেখ রয়েছে যে, অনেক সময় তিনি হযরত আবু তালিবের লিখিত নিম্নোক্ত কবিতাটি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরানী চেহারার দিকে তাকিয়ে আবৃত্তি করতেন। এতে রয়েছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বৃষ্টি প্রার্থনা করলে তিনি মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বেই বৃষ্টির পানি নালা দিয়ে প্রবাহিত হতো।

কবিতাটি নিম্নরূপ ঃ

وابيض يستسقى الغمام بوجهه : ثمال اليتامى عصمة للارامل —

-"উক্ত শুভ্র সুন্দর সত্ত্বা যাঁর সমুজ্জ্বল চেহারার ওয়াসীলা নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়, যিনি ইয়াতীমদের লালন পালন কারী ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা, ১ ঃ ১৩৭)

সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক উক্ত ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ কবিতার আবৃত্তি প্রকাশ করছে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক কত গভীর ছিল। যখনই তাঁদের উপর কোন সমস্যা-বিপদ এসে পড়তো তাঁরা রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে ইস্তিগাছা ও ইস্তিআনার জন্য তৎক্ষণাত ছুটে যেতেন। যখন সাহাবীদের আমলের মাধ্যমে উক্ত মতবিরোধপূর্ণ হাদীস স্পষ্ট হলো আর তা কুরআন সুন্নাহর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণও হয়ে গেলো তখন এ মূর্খ বন্ধুদের ব্যাখ্যা ও ফাতওয়ার মাধ্যমে কুফর ও শিরক আখ্যা দিলে তাকে কিভাবে তাওহীদের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যায়? তাওহীদের কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গী কখনোই একথার অনুমতি দেয় না যে, শুধুমাত্র একটি বিরোধপূর্ণ হাদীসের উপর আমল করে অন্য সকল ইসলামী শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে সকল মুসলিম উম্মাহ্‌র উপর কুফর ও শিরকের অপবাদ দেয়া যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম অধ্যায়

ঈমান ও কুফরের ব্যবধানকারী সীমারেখা

ঈমান ও কুফরের মধ্যে মাজাযী সম্পর্কের স্বীকৃতি

সরওয়ারে কায়িনাত, অলী ও সালিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার সময় সাধারণত মুসলমানরা কখনো কখনো এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেন -ঐ শব্দগুলোর হাক্বীক্বি অর্থ গ্রহণ করা হলে কুফর ও শিরকের পর্যায়ে পড়বে। কিন্তু যেহেতু তাদের অন্তরে উক্ত শব্দগুলোর হাকীক্বি অর্থের পরিবর্তে মাজাযী অর্থই উদ্দেশ্য এবং মাজাযী অর্থেই তা সর্ব সাধারণের কাছে বহুল প্রচলিত ও ব্যবহৃত তাই তাদেরকে শিরকের অপবাদ দেয়া যাবে না। যেমন-

يا اكرم الخلق مالى من الوذبه : سواك عند حلول الحادث العمم —

-"ও হে সমস্ত সৃষ্টি জগতের সর্বোত্তম (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি ছাড়া আমার কেউ সাহায্যকারী নেই-যার কাছে চরম বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করবো।"

لي خمسة اطفى بها حرالوباء الحاطمة : المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة —

-"আমার জন্য এমন পাঁচজন (প্রিয় ব্যক্তি) আছেন, যাঁদের সাহায্যে আমি বিধ্বংসী মহামারী দূর করতে পারি। (আর এঁরা হচ্ছেন) মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আলী মুরতাদ্বা (রাঃ), তাঁর দু'সাহিবজাদা হাসান (রাঃ) ও হুসাইন (রাঃ) এবং সাইয়িদা ফাতিমা যাহরা (রাঃ)।"

يه سب تمهارا كرم هـــ اتا

كه هات اب تك بى هوئ هـــ

-"এ সবই আপনার দয়া হে আমার মালিক, কারণ এখনও আপনার রহমতের প্রস্রবন প্রবাহমান।"

مجھـــ نظر كرم كى بهيك ملـــ

هرا كرئ نهين هـــ تيرى سوا

-" আমাকে আপনার দয়ার দৃষ্টির ভিক্ষা দিন আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই।"

سب كا كوئ نه كوئ دنيا مين اسرا هـــ

ميرا بجيز قميا رى كوئ نهين سهارا ـــ

-"সবারই দুনিয়াতে কোন না কোন আশ্রয়স্থল আছে। আপনি ছাড়া আমার কোন ভরসা স্থল নেই।"

خدا جب هكرى مهراوى محمد

محمد جب هكرى ميرا كوئ نهين سكتا

-"আল্লাহ তায়ালা যখন কাউকে পাকড়াও করবেন তাকে বাঁচাবেন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর যখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে পাকড়াও করবেন তখন তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।"

এভাবে কোন সময় মুসলিম উম্মাহর কেউ কেউ সরওয়ারে দুজাহান (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সম্বোধন করে ليس لنا ملجأ سواك يا رسول الله "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি ছাড়া আমাদের কোন ঠিকানা নেই।" ইত্যাদি শব্দাবলী উচ্চারণ করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদি এ কবিতার পংক্তি ও শব্দগুলোকে সাধারণভাবে হাকীকী বা শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে বক্তাকে কাফির ও মুশরিক মনে হবে। কিন্তু বাস্তবিক কোন মুসলমানের মনে শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় হাক্বীক্বি অর্থ উদ্দেশ্য থাকে না। উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহর পরে শুধুমাত্র আপনার দরবারই আমার জন্য আশ্রয়স্থল। আল্লাহ্ তায়ালার দরবারের পর আপনার আশ্রয়স্থলই আমি পাপী ও গুণাহগারের ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যম ওয়াসীলা। এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতে আপনি ছাড়া আমার কেউ নেই। আপনি ছাড়া অন্য কোন মানুষের কাছে আমার কিছু চাওয়ার নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু সাথে সাথে আমরা এটাও প্রয়োজন মনে করি যে, এ ধরনের শব্দের মাজাযী (রূপক) ভাবে ব্যবহারকারীদের উপর তড়িঘড়ি করে কুফর ও শিরকের ফাতওয়া দেওয়া জ্ঞানীদের কাজ নয়।

একথা স্মরণ রাখাও আবশ্যক যে, এসব মুসলমানদের তাওহীদবাদী হওয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে হবে। মাজাযী অর্থের দিকে না তাকিয়ে কুফর ও শিরকের ফাতওয়া প্রদানকারীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।

উক্ত তাওহীদের উপর বিশ্বাসী মুসলমানগণ ইসলামী আহকাম অনুযায়ী আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাসী। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতেরও সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। নামায পড়েন, যাকাত আদায় করেন। যেহেতু তারা ইসলামের সকল আহকামের উপর আমল করেন তাই কয়েকটি শব্দের মাজাযী ব্যবহারের কথিত অপরাধে তাদের ইসলামের গণ্ডি থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক? সাইয়িদুনা আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাজেদারে কায়িনাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন-

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِى لَهُ ذمة اللهِ وذمة رسوله فلا تخفروا الله فِي ذمته –

-"যে আমাদের মতো নামায পড়ে। আমাদের কিবলাকে কিবলা বানায় এবং আমাদের জবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে সে এমন মুসলমান যার জন্য রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মাদারীকে ত্যাগ করো না।" (সহীহুল বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, ১ ঃ ৫৬)

সহীহ বুখারীর এ হাদীসে মুবারকের পরে সাধারণ মুসলমানদেরকে মাজাযে আকলীর যথার্থ ব্যবহারের কারণে মুশরিক বলার আর কোন বৈধতা বাকী থাকলো না। মাজাযে আকলীর ব্যবহার কুরআন, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলে বহু জায়গায় পাওয়া যায়। এটাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। একজন মুমিন থেকে এ ধরনের কথা প্রকাশ পাওয়াকে মাজাযে আকলী ধরে নেওয়ার মধ্যে কোন অজুহাত বাধা হতে পারে না।

সহীহ ইসলামী আকীদা মোতাবেক যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, আল্লাহ তায়ালাই বান্দার মালিক ও খালিক, তিনিই সে আমল ও কাজের শক্তি দান করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জীবিত ও মৃতের ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন। তবে আল্লাহ নিজেই খুশী হয়ে তার প্রার্থনা ও সুপারিশ কবুল করেন। এমন আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিই প্রকৃত মুমিন ও মুসলমান। এটাই তাওহীদ। এটাই

ইসলামী আকীদা। যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) সায়্যিদাহ মারয়াম (আঃ)-এর সাথে কথোপকথনের সময় আল্লাহ তায়ালার কাজকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করে মাজাযে আকলীর উদাহরণ পেশ করেছেন। কুরআন মাজীদে জিবরাঈলের (আঃ)-কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا "আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করবো)।"

যদি আল্লাহ তায়ালার নূরানী মাখলূকের সর্দার এ ধরনের মাজাযী (রূপক) শব্দাবলীর সম্পর্ক নিজের দিকে করতে পারেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেই সে কথাকে কালামে মাজীদে পুনরুল্লেখ করতে পারেন তাহলে কোন মানুষ যদি এ ধরনের শব্দকে তাজেদার আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্পর্কিত করেন তাতে অসুবিধা কি? প্রয়োজন হচ্ছে কুরআন মাজীদের প্রকৃত রূহ সম্পর্কে জানতে হবে যাতে মুসলমানরা পরস্পরকে কাফির বলা থেকে বিরত থাকে। এতেই ইসলামের কল্যাণ। এর মধ্যেই আমাদের সকলের ঈমানের মঙ্গল।

শেষ কথা

এখন আমরা আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে প্রথম দিকে লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা নতুনভাবে পুনরায় উল্লেখ করতে চাই। বর্তমান যুগে কিছু লোক কুরআন করীমের আয়াতের ক্ষেত্রে হাক্বীক্বত ও মাজাযের পার্থক্য এবং মধ্যপন্থা ত্যাগ করেছেন। তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে কুরআনের শব্দাবলী থেকে শুধুমাত্র হাকীকী অর্থের ভিত্তিতে দলীল গ্রহণ করা। তারা মাজাযী অর্থের বৈধতাকে স্বীকার করেন না। এ কারণে তারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস ও পূর্বসূরী ইমামগণের কুরআনী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিমুখ হয়ে তাফসীর বির রাই' অর্থাৎ মনগড়া তাফসীর প্রণয়ন করছেন। ইসলামী আকীদার ময়দানে বিদআত সৃষ্টি এবং কুরআন করীমের প্রকৃত অর্থ থেকে বিচ্যুত হয়ে আকাইদের ব্যাখ্যা উপস্থাপনে লিপ্ত।

মধ্যমপন্থা ছেড়ে দিয়ে অন্য দলটিও জেদের বশে মাজাযের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত। অথচ মধ্যমপন্থা সকল ক্ষেত্রেই আবশ্যক। হাক্বীক্বত ও মাজাযের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি কুরআনী মধ্যমপন্থাকে গ্রহণ করা হয় তাহলে এ দুটি দলের মধ্যকার সমুদ্রতুল্য দূরত্ব ঘুচিয়ে মুসলিম উম্মাহ্কে পুনরায় একটি শরীরে পরিণত করা সম্ভব হবে। এ পদ্ধতি সত্য দ্বীনের সংরক্ষণ ও তাওহীদের মর্যাদার প্রকৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য জরুরী ও কার্যকর।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থাবলী

১।	জা'আল হক (১)	মুফতি আহমদ ইয়াব খান নঈমী
২।	জা'আল হক (২)	"
৩।	জা' আল হক (৩)	"
৪।	সালতানতে মুস্তাফা	"
৫।	আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৬।	দরসুল কুরআন	"
৭।	ইলমুল কুরআন	"
৮।	অপব্যাখ্যার জবাব	"
৯।	হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাঃ)	"
১০।	বিশ্বনবী নূরের রবী	"
১১।	ইসলামী জিন্দেগী	"
১২।	ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	আলা হযরত শাহ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১৩।	মাতা -পিতার হক	"
১৪।	তাজিমী সিজদা	"
১৫।	পীর মুরীদ ও বায়আত	"
১৬।	বাহারে শরীয়ত	মুফ্তি মুহাম্মদ আমজাদ আলী
১৭।	কানুনে শরীয়ত	মুফ্তি শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৮।	কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৯।	যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
২০।	আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
২১।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (১)	আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর
২২।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (২)	"
২৩।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৩)	"
২৪।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৪)	"
২৫।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৫)	"
২৬।	ইসলামের বাস্তব কাহিনী (৬)	
২৭।	গ্রন্থ পরিচিতি	মুফ্তি আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী
২৮।	সাত মাসায়েলের সমাধান	হযরত এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী
২৯।	কসীদায়ে বোরদা	আল্লামা বুছরী
৩০।	খাজা গরীবে নেওয়াজ	মাওলানা আবদুর রশীদ
৩১।	মুমিন কে?	আল্লামা ড. তাহেরুল কাদেরী
৩২।	আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা	"
৩৩।	ইছালে ছওয়াব	"
৩৪।	জশ্নে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.)	"
৩৫।	গাউসুল আযম	শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী
৩৬।	খুতবাতে ইবনে নাবাতা	হযরত আল্লামা ইবনে নাবাতা
৩৭।	মিলাদে মোস্তফা	মোহাম্মদ ইকবাল

মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬১৮৮৭৪

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান ● শেখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী ● মুহাম্মদী কুতুবখানা

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাছে

সাহায্য প্রার্থনার শরয়ী বিধান

শেখুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহেরুল কাদেরী

মুহাম্মদী কুতুবখানা